ইতিহাসের জানালা

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রধান শাখা : ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং : ২০
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
দ্বিতীয় শাখা : জি-২৪, দক্ষিণ বনশ্রী, খিলগাঁও, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০ ৮৭ ৪৩, ০১৯১২ ০৩ ৪৭ ৯০

ইতিহাসের জানালা

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম মুদ্রণ : জুন ২০১৫, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, শাবান ১৪৩৬
প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রধান শাখা : ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং : ২০
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
দ্বিতীয় শাখা : জি-২৪, দক্ষিণ বনশ্রী, খিলগাঁও, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯১৩ ৫০ ৮৭ ৪৩, ০১৯১২ ০৩ ৪৭ ৯০
প্রচ্ছদ : কারুকাজ
মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স
মূল্য : ২১০ টাকা

Itihasher Janala by Salahuddin Jahangir
Published in Bangladesh by Noboprokash
Shop No : 20, Islamic Tower, Banglabazar, Dhaka
Mobile : 01913 50 87 43, 01912 03 47 90
e-mail : noboprokash@gmail.com
Price : Taka 210 only

অর্পণ

কিছু মানুষের বন্ধুত্ব এমন–
তারা দূরে গেলে তাদের শূন্যতা অনুভূত
হয় না, কিন্তু কাছে থাকলে তাদের
দূরত্বের শূন্যতা অনুভব করি।

বন্ধু *এহসান সিরাজকে*

সমীপেষু

অতীত সবসময়ই শিক্ষাদাত্রী। যদিও অনেকেই বলে থাকেন– ইতিহাস এটাই শিক্ষা দেয় যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না।
আমরা সর্বদা আশাবাদী ইনসান। হতাশাবাদীদের শ্লেষা নিয়ে জীবনকে থামিয়ে দিতে পারি না। যদিও আমরা শিক্ষাহীন দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ি প্রায়ই। তবু আমাদের কাছে অতীত যেমন, তেমনি বর্তমানও সামনে এসে শিক্ষয়ত্রী হিসেবে বাহুডোর প্রসারিত করে দাঁড়ায়। ইতিহাস থেকেই তো তুলে নিতে হয় বর্তমান পৃথিবীর সফলতার পদছাপ। ইতিহাসের আবেদন তাই আমাদের ধর্মীয় এবং জাতীয় জীবনে অবশ্যম্ভাবী।

এ গ্রন্থ ছোট ছোট করে অনেক ইতিহাসের স্মরণ দিয়েছে। নিকট অতীত, সুদূর অতীত, প্রাগৈতিহাসিককাল– ইতিহাসের নানাস্তরের ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান, যুদ্ধ, বিজয়, বেদনা জায়গা করে নিয়েছে গ্রন্থের সাদা পাতায়। কেবল জ্ঞান নয়, এ গ্রন্থ ফের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে মানুষের মাঝে মানুষের ইনসানিয়্যাত।

ইতিহাসপাঠে বাঙালিসমাজে অনীহা যেমন আছে, তেমনি ইতিহাসসন্ধানী অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরও কমতি নেই। বইয়ের বাজারে নজর দিলে এর সত্যতা নজরে আসে খুব স্বাভাবিকভাবেই। আমরা তাই আশাবাদের কথা বলতে চাই, শোনাতে চাই, জানাতে চাই সবাইকে। এ গ্রন্থ আশাবাদেরই এক নির্ঘুম দলিল।

গ্রন্থে যুথবদ্ধ এসব ইতিহাসের অধিকাংশ এর আগে *সাপ্তাহিক লিখনী*তে ধারাবাহিকভাবে 'অতীতের জানালা' নামে প্রকাশ হয়েছে। পাঠকের পাঠ সুবিধার্থে সেসব ইতিহাসে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে যৌক্তিক কারণেই। কেননা পত্রিকার পাতার ফিচার আর বইয়ের পাতার পঠন এক জিনিস নয়। কিছু ইতিহাস নতুন করে সংযোজন করতে হয়েছে বইটিকে সামগ্রিকতার বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য করতে।

ইতিহাস তালাশের এই সফরে দুজন সুহৃদ আমাকে অকারণে সাহায্য করেছে। সাদ রহমান এবং তানজিল আমির– আমার প্রিয় দুজন প্রতিভালক্ষী তরুণ। তাদের রচিত কিছু ইতিহাস এখানে সংযোজিতও হয়েছে। ভবিষ্যতে তারাও ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হোক, সে আশাবাদ আজীবনের।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি *নবপ্রকাশ*-এর কর্ণধার আমার একান্ত বন্ধুজন তামীম রায়হায়নকে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন বলে। বইটি তার কাছে পাঠানোর পর তিনি সম্ভবত দু-চার পাতা না পড়েই এটিকে প্রকাশের 'আনকাট' ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন। ভাগ্য ভালো, পড়লে হয়তো এটা ছাপার যোগ্য মনে হতো না!
নবপ্রকাশ-এর প্রকাশক এম. আসাদুল্লাহ খানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার অসীম ধৈর্যবতী স্বভাবের কারণে। ধৈর্যের ডালি সাজিয়ে সে বই প্রকাশ করেই ছেড়েছে। তার এই মধুর ধৈর্যধারণ চলমান থাকুক– প্রত্যাশা করি সবসময়।

সবশেষে পাঠক! ইতিহাসের ছোট ছোট এই দস্তরখান যদি আপনার পাঠ করে ভালো লাগে, আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহর কাছে অন্তত একজন মানুষের ভালোলাগার অসিলা নিয়ে কেয়ামতের দিন দাঁড়াতে পারবো। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

–সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রকাশকের কলম

আল্লাহ্ তায়ালার লাখো কোটি শোকর।

নবপ্রকাশ যাত্রা শুরু করার পর থেকেই আমরা চেষ্টা করছি বাজারি চলতি ধারার বাইরে এসে পাঠককে নতুন কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। ভালো পাণ্ডুলিপি, সেরা লেখক, দক্ষ সম্পাদক, ছাপা ও বাঁধাইয়ে সবসময় চেষ্টা করেছি অন্যদের থেকে একটু আলাদা রুচি ও গুণগত মান বজায় রাখতে। কতোটুকু পেরেছি, সে ভার পাঠকের উপর। পাঠকই আমাদের মান পরখ করার সেরা মানদণ্ড।

'ইতিহাসের জানালা' সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের একটি সুপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ। ছোট ছোট করে অনেক ইতিহাসের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে এখানে। যাতে একই মলাটে পাঠক ভিন্ন স্বাদের অনেক ইতিহাস পাঠ করতে পারেন।

লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। তিনি তার নিজস্ব লিখনী স্টাইল দিয়ে পাঠকমহলে ইতোমধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছেন। তিনি বরাবরই ইতিহাসসন্ধানী। তার অনুসন্ধিৎসা, ইতিহাসবিচার এবং প্রাঞ্জল গদ্য এই বইকে করে তুলেছে আরও বাঙময়।

পাঠকের ভালো লাগলে আমরা সামনে এগুনোর দুঃসাহস পাবো। আল্লাহর কাছে এই কামনাই করি। আমিন!

–এম. আসাদুল্লাহ খান

সূচীপত্র

লায়ন অব ডেজার্ট

ওমর আল মুখতারকে মনে রেখো পৃথিবী ১১

লায়লা খালিদ

দুঃসাহসী এক হাইজ্যাকার ১৫

আসাম ম্যাসাকার ১৯৮৩

৬ ঘণ্টায় হত্যা করা হয় ৫০০০ বাংলাদেশিকে ১৮

চির স্মরণীয় আত্মত্যাগ

রেশমি রুমাল আন্দোলন ২২

ঢাকার দলিল

শাহবাগের ইতিহাস ২৬

কভু ভোলবার নয়

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ ২৯

বারোভূঁইয়ার বীর

মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁ ৩৩

ইতিহাসের ইতিহাস

সুয়েজ খালের পেছনের গল্প ৩৭

লর্ড রবার্ট ক্লাইভ

মৃত্যুও যাকে ক্ষমা করেনি ৪১

পলাশীর যুদ্ধ

বিশ্বাসঘাতকদের শেষ পরিণতি ৪৪

১৯৭১-এ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মন্তব্য

'পাকিস্তানিরা স্টুপিড, ইন্ডিয়ানরা প্রতারক' ৪৮

মাদার তেরেসা

মানবসেবার প্রবাদপ্রতিম নাম ৫১

মুজিবনগর সরকার

স্বাধীনতাযুদ্ধের নীরবচ্ছিন্ন পাওয়ার হাউজ ৫৫

শ্রমিকের দুর্বার জেদ

আট ঘণ্টার বেশি কাজ নয় ৫৯

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন
ব্যথাতুর ভাঙন-রদের ইতিহাস ৬২
ইখওয়ানুল মুসলিমিন
ইতিহাস ও ত্যাগের উপাখ্যান ৬৫
বৃটিশ সিংহাসন
রাণীর বেশে প্রথম এলিজাবেথ ছিলেন পুরুষ! ৬৮
রহস্যঘেরা মিসর
রসহ্যময় মমি ৭১
অবিস্মরণীয় বাঙালি
অনেক উচ্চতায় ড. ফজলুর রহমান খান ৭৫
ইতিহাস পাল্টে দেয়া পাঁচটি রমজান ৭৮
পৃথিবীর লজ্জিত ইতিহাস
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৮১
ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ৮৪
চিনের প্রাচীরের আড়ালে
রক্তাক্ত তিয়েনআমেন স্কয়ার ৮৭
হেলেন কিলার
এক অন্ধ ইতিহাস ৯০
ইতিহাসের ঘৃণা ও ভালোবাসা
অ্যাডলফ হিটলার আর নাৎসি বাহিনী ৯৩
পৃথিবীর অভিশাপ
কেন অভিশপ্ত বিতাড়িত ইহুদিরা ৯৬
আমেরিকার গোপন লজ্জা
ভিয়েতনামের যুদ্ধ ৯৯
ইউরোপের কান্না
চেরনোবিল দুর্ঘটনা ১০২
ইউরোপা শহর
হাজারও স্মৃতির নগরী ইস্তাম্বুল ১০৫
৬ মে ঐতিহাসিক বালাকোট
স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস ১০৮
বিস্মৃত ইতিহাসের হাতছানি
চিন দেশে ইসলামের সূচনা ১১২

উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়
নিজ দেশে পরদেশি ১১৬
বাগদাদের করুণ কাহিনি
তাতার তাণ্ডবের ক্যানভাস পাঠ ১২২
ভাস্কো দা গামা
ভারতবর্ষে ইউরোপের পথপ্রদর্শক ১২৫
নেলসন ম্যান্ডেলা
কয়েদি নাম্বার ৪৬৬৬৪ .... ১২৯
রেসকোর্স থেকে রমনা পার্ক
স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর রাজসাক্ষী ১৩৩
বাংলা সংবাদপত্রের পুরোধা
মানিক মিয়া ও দৈনিক ইত্তেফাক ১৩৭
সত্যের আলোকমশাল
মুনশি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ১৪১
বাংলার অবিস্মরণ
ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস ১৪৫
লাইব্রেরি অব আলেকজান্দ্রিয়া
জ্ঞানের ইতিহাসের পতন ১৪৮
ইতিহাসের নীরব মহানায়ক
শহিদ নুরালদীন রহ. ১৫২
অদম্য সাহসের নগর
অজেয় শহর কনস্টান্টিনোপল ১৫৬
সাইফ উল আজম
আকাশ জয়ের নায়ক ১৫৯
অটল ইতিহাস
গুস্তাভো আইফেলের আইফেল টাওয়ার ১৬২
ফকির মজনু শাহ
স্বাধীনতা সংগ্রামে এক দরবেশ ফকির ১৬৪

ইতিহাসের জানালা

লায়ন অব ডেজার্ট

ওমর আল মুখতারকে মনে রেখো পৃথিবী

তুর্কি উসমানি খেলাফত ভাঙার সকল চক্রান্ত ততোদিনে সফলভাবে শেষ হয়েছে। ইউরোপজুড়ে চলছে রাষ্ট্র আর সাম্রাজ্য ভাঙা-গড়ার খেলা। যার হাতেই শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে সে-ই হামলে পড়ছে পাশের দেশের ওপর, দখলে নেবার জন্য। ইংরেজদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যে যদিও তখন ভাটার টান তবে তাদের ভাটার ফলে ইউরোপে উদিত হয় ইতালি, জার্মানি আর রাশিয়ার মতো নতুন পরাশক্তির। সবাই তখন গ্রাসোন্মুখ। দুর্বল বলে যাকে পাচ্ছে তার দিকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভী হাত।

লিবিয়া তখন তুর্কি খেলাফতের বাগডোর থেকে আলাদা হয়ে ভীষণ বেকায়দা অবস্থায়। এমনই সংকটাপন্ন অবস্থায় ১৯১১ সালের অক্টোবরে ইতালীর ঔপনিবেশিক সেনারা লিবিয়ার ত্রিপোলি শহরের সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছে। সেই সেনাদলের পদাতিক বাহিনীর নেতা ফারাফেলি লিবীয়দের জানায়, হয় তারা আত্মসমর্পণ করবে ইতালির কাছে নয়তো পুরো শহর গুঁড়িয়ে দেয়া হবে।

প্রতিরোধশক্তিহীন লিবীয়রা জীবন বাঁচাতে পালাতে শুরু করে। তবু ইতালিয়ান সেনারা তিনদিন ধরে অবিরামভাবে শহরটির ওপর বোমা নিক্ষেপ অব্যাহত রাখার পর লিবীয়দের ইতালির সঙ্গে সংযুক্তি হওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই সময়টিতে লিবিয়ার মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন নিতান্ত অপরিচিত এক লোক। নাম ওমর আল মুখতার। তিনি ইতালীয় প্রস্তাব গ্রহণ করা তো দূরের কথা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ইতালীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ শুরু করে দেন।

ওমর মুখতার লিবিয়ার পূর্ব সিরনিকার আলবুতনান জেলায় জানজুর গ্রামে ২০ আগস্ট ১৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মা-বাবা হারান। স্থানীয় এক মসজিদে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। মুসলিম শাসনে বিশ্বাসী জনপদ সেনুসি আন্দোলনের মূলকেন্দ্র জাঘবুবের সেনুসি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ৮ বছর শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৯ সালে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ চাদে ফরাসিদের প্রতিহত করার জন্য রাবিহ্ আল জুবায়েরের সাহায্যার্থে অন্য সেনুসিদের সঙ্গে তাকে চাদে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে বীরত্বের পরিচয় দেন।

পেশাগত দিক থেকে কুরআন শিক্ষক হলেও মুখতার মরুভূমিতে যুদ্ধকৌশল বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। স্থানীয় ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা ছিলো। তার এই জ্ঞানকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালীয়দের বিরুদ্ধে কাজে লাগান। ইতালীয়রা মরু অঞ্চলে যুদ্ধের সঙ্গে পরিচিত ছিলো না। মুখতার তার ছোট সৈন্যদল নিয়ে সফল গেরিলা আক্রমণে সক্ষম হন। আক্রমণের পর তার বাহিনী মরুভূমিতে আত্মগোপন করতো। পরবর্তীতে তার সাহসিকতার জন্য শত্রুরাই তার নাম দেয় 'লায়ন অব ডেজার্ট'—মরুসিংহ।

ওমর মুখতার নামের বেদুইন মানুষটি ততোদিনে ইতালির শাসকদের কাছে একটি আতঙ্কের নাম হিসেবে ছড়িয়ে গেছে। কারণ ওমর তার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বিদেশি আগ্রাসন প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে অনেক ইতালিয়ান সেনাকে ধরাশায়ী করেছেন।

মুসোলিনি ইতালির আরেক রক্তপিপাসু সেনাপ্রধান জেনারেল রডলফো গ্রেজিয়ানিকে লিবিয়ার গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন ওমরকে শায়েস্তা করার জন্য এবং বলেন, 'গত বিশ বছর ধরে একটা খামোখা যুদ্ধে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, পাঁচ পাঁচটা গভর্নর সেখানে নিয়োজিত থেকেও ওমর মুখতারকে দমন করতে পারলো না। আশা করি তুমি সেই কাজটি করতে পারবে।'

ইতালীয় গভর্নর আর্নেস্ট বমবেলি ১৯২৪ সালে জেবেল আখদারের পার্বত্য অঞ্চলে পাল্টা গেরিলা বাহিনী গঠন করেন, যা বিদ্রোহীদের ওপর বেশ কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করে। মুখতার দ্রুত তার কৌশল পাল্টান এবং তখন তিনি মিসর থেকে সাহায্য লাভে সমর্থ হন।

১৯২৭ সালের মার্চে ইতালীয়রা জাঘবুব দখল করে। ১৯২৭ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত মুখতার সেনুসি বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। তার দক্ষতার কারণে ইতালীয় গভর্নর জেনারেল আটিলিয়ো তেরুজ্জি ওমরকে 'ব্যতিক্রমী স্থীরচিত্ত ও অটল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন' বলে উল্লেখ করেন।

১৯২৯ সালে পিয়েত্রো বাদোগলি গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান। ওমর মুখতারের সঙ্গে আলোচনায় তাকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। সেই বছরের অক্টোবরে মুখতার এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন এবং ইতালীয় সেনানায়ক রডোলফো গ্রাজিয়ানির সঙ্গে ব্যাপক যুদ্ধের জন্য লিবীয় যোদ্ধাদের পুনরায় সংগঠিত করেন। পরবর্তী বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি সেনাপতি গ্রাজিয়ানিকে পরাজিত করেন।

তবে ইতালীয় বাহিনী সম্মুখ সমরে ওমর আল মুখতারকে পরাজিত করতে না পেরে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সহস্রাধিক মানুষকে উপকূলবর্তী কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়, গিয়ারাবুবে উপকূল থেকে লিবিয়া ও মিসরের সীমানা বন্ধ করে দেয়া হয়। যাতে যোদ্ধারা কোনো বিদেশি সাহায্য না পায় এবং স্থানীয় জনতার সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়।

সেনুসিদের প্রতিরোধে গ্রাজিয়ানির এই পরিকল্পনা সফল হয়। বিদ্রোহীরা সাহায্যবঞ্চিত হয় এবং ইতালীয় বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়। স্থানীয় চর ও সহায়তাকারীদের সাহায্যে ইতালীয় বাহিনী স্থলযুদ্ধেও বিদ্রোহীদের ওপর আধিপত্য স্থাপন করে। ঝুঁকি সত্ত্বেও মুখতার লড়াই চালিয়ে যান। ১৯৩১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাকে অতর্কিত আক্রমণ করে গ্রেফতার করা হয়।

ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে মুখতারের প্রায় ২০ বছরব্যাপী লড়াই ১৯৩১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তার গ্রেফতারের মাধ্যমে সমাপ্তি লাভ করে। স্লোনটার কাছে এক যুদ্ধে তিনি আহত অবস্থায় গ্রেফতার হন। তাকে গ্রেফতারে সাহায্য করায় স্থানীয় নেতাদের পুরস্কৃত করা হয়।

মাত্র তিনদিনের মধ্যেই মুখতারের বিচার সম্পন্ন হয়। বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ১৪ সেপ্টেম্বর রায়ে তাকে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। তবে ঐতিহাসিকদের মতে এই বিচার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ছিল না।

মৃত্যুর পূর্বে শেষকথা জানতে চাওয়া হলে মুখতার কুরআনের আয়াত 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' (আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যাবো) পাঠ করেন। ১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সুলুকের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে তার অনুসারীদের সামনে সত্তর বছর বয়সী ওমর আল মুখতারকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।

ওমর আল মুখতার যদিও পরাজিত হয়েছিলেন তার ২০ বছরকালীন স্বাধীনতা যুদ্ধে, কিন্তু ইতালি তো বটেই সমগ্র ইউরোপ এবং আরবে তিনি অমর হয়ে আছেন অকুতোভয় স্বাধীনতাকামী 'লায়ন অব ডেজার্ট' নামে। কারণ বর্তমানের স্বেচ্ছাচার আর মিথ্যাশক্তির কাছে বিশ্ব মাথা নোয়ালেও ইতিহাস কখনও সত্যকে ভোলে না।

লায়লা খালিদ
দুঃসাহসী এক হাইজ্যাকার

বিপ্লবী 'লায়লা খালিদ'। এই নামেই তিনি বিখ্যাত হয়েছেন, পরিচিতি পেয়েছেন বিশ্বব্যাপী। ফিলিস্তিনি বিপ্লবী সংস্থার (পিএফএলপি) একজন সদস্য তিনি। বিমান ছিনতাই করে তিনি প্রথম বিমান হাইজ্যাকার হিসেবে পরিচিত পান দুনিয়াজোড়া।
১৯৪৪ সালে ফিলিস্তিনের ছোট্ট শহর হাইফায় জন্ম লায়লার। তার জন্ম ছিলো এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে যখন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ওপর নেমে আসছিলো বিশ্বের মোড়লদের চাপিয়ে দেয়া ইসরায়েল নামের ইহুদি বিষফোঁড়া আর মাতৃভূমি ছেড়ে ফিলিস্তিনিরা নিরুপায় হয়ে চলে যাচ্ছিলো অজানা গন্তব্যে।
জন্মের চার বছর পরই ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল সংকটের সময় পরিবারসহ লায়লারা নির্বাসিত হন লেবাননে। হয়ে পড়েন উদ্বাস্তু। সে সময় তার বাবা ও বড়ভাই পিএফএলপির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বাবা ও বড়ভাইয়ের পথ অনুসরণ করেন লায়লা। ১৫ বছর বয়সে যোগ দেন বিপ্লবী এ সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে।
১৯৬৮ সালে পিএফএলপির স্পেশাল স্কোয়াডের একজন নারী ফ্রিডম ফাইটার হিসেবে গণ্য হন তিনি। একজন নারী হিসেবে লায়লা ছিলেন অদম্য সাহসী। সেই সঙ্গে তার বুকের মধ্যে সারাক্ষণ অগ্নিগিরির মতো জ্বলতো ছেড়ে আসা মাতৃভূমির দগদগে ক্ষত। এই জ্বলুনিই পরবর্তীতে তাকে বানিয়েছিলো ইতিহাসের মহানায়িকা।
সময়টা ১৯৬৯-এর ২৯ আগস্ট। পিএফএলপি-এর সদস্য সালিম ঈসায়ি ও লায়লা খালিদ ইতালির রোম থেকে হাইজ্যাক করেন রোম থেকে এথেন্সের উদ্দেশে ছেড়ে আসা একটি বিমান। সে সময় বিমানের নিরাপত্তা

ব্যবস্থা এতোটা কড়াকড়ি ছিলো না, বিধায় লায়লার জন্য অস্ত্র নিয়ে বিমানে আরোহন করতে তেমন অসুবিধা হয়নি। বিমান উড্ডয়নের একটু পরই পাইলট ও ক্রুদের জিম্মি করে লায়লা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন বিমানের কন্ট্রোল।

লায়লাদের পরিকল্পনা ছিলো বিমানের কন্ট্রোল নিয়ে সোজা দামেশকের দিকে যাওয়া। দামেশক বিমানবন্দরে বিমান ল্যান্ড করে যাত্রীদের জিম্মি করবেন। এরপর জিম্মিদের নিয়ে তারা ইসরায়েলের সঙ্গে বন্দিবিনিময়ের দর কষাকষি করবেন। কিন্তু ছেলেবেলায় হাইফা থেকে চলে এলেও জন্মভূমির প্রতি তার ভালোবাসা ছিলো অদম্য। তাই বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লায়লা পাইলটকে বাধ্য করেন ফিলিস্তিনের হাইফা বিমানবন্দরে যেতে, যাতে নিজের মাতৃভূমি দেখতে পারেন।

এ হাইজ্যাকিংয়ের সময় তার একটি ছবি তোলা হয়। যেখানে তিনি একে-৪৭ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরে এই ছবিটি বিখ্যাত একটি বিপ্লবী প্রতীকে খ্যাতি লাভ করে এবং ফিলিস্তিনে এই ছবিটি অন্যান্য বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে পরিণত হয়।

বিমানটিকে দামেশকে নিয়ে যাওয়া হয় যাত্রীদেরকে নামিয়ে দেয়ার জন্য এবং সব যাত্রীদের তারা নিরাপদে দামেশক বিমানবন্দরে নামিয়ে দেন। শুধু দুজন ইসরাইলি যাত্রী বাদে। এই দুজন ইসরায়েলি জিম্মিকে নিয়েই পরবর্তীতে ইসরায়েলের সঙ্গে বন্দিবিনিময় করা হয়। অবশ্য এ হাইজ্যাকিংয়ের সময় কোনো যাত্রী হতাহত হয়নি। পিএফএলপি সদস্যও ধরা পড়েননি। লায়লাসহ সব ক'জন হ্যাইজ্যাকার নিরাপদে সরে যেতে পারেন।

একবার বিমান হাইজ্যাক করেই থেমে থাকেননি লায়লা। তিনি প্রথম সফলতার পর আরো বেশি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন এবং আরো সাহসী হয়ে ওঠেন। তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকেন পরবর্তী এ্যাকশন নেয়ার জন্য। তবে তার এই কাজটি মোটেও সহজ ছিলো না। কারণ ততোদিনে তার ছবি ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা বিশ্বে। ছবি ছড়িয়ে পড়ার কারণে চেহারা যেনো না চেনা যায়, সে জন্য ছয়বার প্লাস্টিক সার্জারি করেন তিনি।

এরপর তিনি অংশ নেন দ্বিতীয় হাইজ্যাকিংয়ে। এবারের উদ্দেশ্য ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি। এবার অবশ্য এতো সহজেই কাজ সমাধা হয়নি এবং সফলও হয়নি মিশন।

১৯৭০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর লায়লা খালিদ এবং আরেকজন বিপ্লবীকর্মী আমস্টারডাম থেকে নিউইয়র্কগামী ফ্লাইট-২১৯ হাইজ্যাক করেন। বিমানের কন্ট্রোল নেবার সময় সহযোগী কর্মী প্যাট্রিকের গুলিতে একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট মারা যান। কিন্তু লায়লার কঠোর নির্দেশ ছিলো কোনো যাত্রী যেনো আহত না হয়। বিমানের এয়ার মার্শাল বিমানের কন্ট্রোল নিয়ে নেন, প্যাট্রিক মারা যান আরেকজন এয়ার মার্শালের গুলিতে। লায়লাও আহত হন। বিমান হিথ্রো বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে এবং লায়লাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৬ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি মূলত একটি ধারাবাহিক একাধিক হাইজ্যাকিংয়ের অংশ ছিলো। প্রায় একই সময়ে পাঁচটি বিমান হাইজ্যাক করেছিলো পিএফএলপির সদস্যরা। ধারণা করা হয়, লায়লার ধরা পড়ার বিষয়টিও ছিলো পরিকল্পিত, যাতে অন্যান্য হাইজ্যাকারদের দিকে কর্তৃপক্ষ কড়া নজর না দিতে পারে।

লায়লাকে বৃটিশ সরকার মুক্ত করে ১ অক্টোবরে বন্দি বিনিময় হিসেবে। এখানেও নাটকীয়তা এবং হাইজ্যাকিং। পিএফএলপি একটি বিমান হাইজ্যাক করে ও ৩০০ জনকে জিম্মি করে দাবি করে লায়লাকে মুক্তি দেয়ার। পরে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

একজন নারী হিসেবে লায়লা দেশমাতৃকার জন্য যা করেছেন নিঃসন্দেহে তা সাহসের কাজ। এই ঘটনার পর তিনি বিভিন্ন সময়ে ফিলিস্তিনকে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করতে আরো অনেক দুঃসাহসী কাজে অংশগ্রহণ করেন। আর এসব দুঃসাহসী কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় তাকে বিভিন্ন দেশের কারাগারে কাটাতে হয়েছে জীবনের সোনালি সময়। তবুও দমে যাননি লায়লা। এখনও তিনি বেঁচে আছেন, আর বেঁচে থেকেই স্বপ্ন দেখেন স্বাধীন ফিলিস্তিনের।

সূত্র : *ইন্টারনেট*

আসাম ম্যাসাকার ১৯৮৩

৬ ঘণ্টায় হত্যা করা হয় ৫০০০ বাংলাদেশিকে

একটি হত্যাকাণ্ডের খসড়া

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষদের এক জনপদ গড়ে ওঠে। এ অভিবাসন নতুন নয়। দেশবিভাগের আগে এ উপমহাদেশে এটা ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার। ভারতের জ্যোতি বসু, সুচিত্রা সেন, সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ, বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ পরভূমে এসে থিতু হওয়ার অন্যতম উদাহরণ। সেই একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্তের কাছাকাছি ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় আবাস গড়ে ওঠে লাখখানেক বাংলাদেশির। যারা আসামে অনেকদিন ধরেই বসবাস করে আসছিলো।

১৯৭৯ সালের শুরুর দিকে, আসামের নির্বাচন কমিশন ৪৫ হাজার বিদেশি ভোটারকে ভোটের অধিকার দেন। ঘটনার শুরুটা এখানেই। 'অল আসাম স্টুডেন্ট ফোরাম' ঘোষণা করে, বিদেশিদের ভোটার হিসেবে এদের অন্তর্ভুক্ত করলে আসামে রক্তের হোলি বইয়ে দেয়া হবে। শুরু হয় বাংলাদেশি খেদাও আন্দোলন। সঙ্গে যোগ দেয় আরো কিছু রাজনৈতিক সংগঠন। এমন উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোকে নিয়ে গঠন হয় All Assam Gana Sangram Parishad (AGSP)। AGSP-এর বাংলাদেশি খেদাও আন্দোলনে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত প্রায় ৩০০-এর মতো খুন, দেড় হাজারের বেশি মানুষ আহত, জ্বালাও-পোড়াওসহ অনেক ঘটনা ঘটে।

এমনই সংক্ষুব্ধ সময়ে দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ঘোষণা করে। এ নির্বাচন আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপে নির্বাচনের আয়োজন হয়। মূলত সেদিন থেকেই আসাম অগ্নিগর্ভ রূপ ধারণ করে।

কপিলি একটি নদীর নাম

নেলি গৌহাটির পূর্বদিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি ছোট শহর। পাশেই বয়ে চলেছে ক্ষীণস্রোতা নদী কপিলি। ফেব্রুয়ারির ১৭ তারিখে দুই ট্রাকভর্তি পুলিশ আসে নেলির পরিস্থিতি শান্ত রাখতে। নেলির বাঙালি মুসলিম অধিবাসীরা খুশিই হয়েছিলো পুলিশের নিরাপত্তা পেয়ে। পরদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি নেলির শান্তিপ্রিয় মুসলমান কৃষক-শ্রমিকরা নিরাপত্তাবোধ নিয়েই যার যার কাজে চলে যায়। বাড়িতে থাকে কেবল নারী আর শিশুরা।

সকাল ৮টা ত্রিশ মিনিট। হঠাৎ করেই নেলির তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলে কয়েক হাজার সশস্ত্র অসমিয়া। তাদের হাতে ছিলো রামদা, ছুরি, বর্শা, কুড়াল এবং দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র। মুহূর্তেই শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা পরিবার নয়, সামনে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যার নির্দেশ আসে। যেহেতু অধিকাংশ বাড়ির পুরুষরা বাইরে ছিলো তাই হত্যার শিকার হয় নারী ও শিশুরা। প্রাণ বাঁচাতে মুসলমানরা ছুটে যায় কপিলি নদীর দিকে। কিন্তু সেখানে আগে থেকেই ওঁৎ পেতে ছিলো হামলাকারীরা। শুরু হয় নির্বিচারে মানুষ খুন। রক্তে লাল হয়ে ওঠে কপিলির স্বচ্ছ পানি। লাশে লাশে ভরে ওঠে নদীর দীর্ঘ পাড়। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া হয় হাজার হাজার ঘরবাড়ি। সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হয়ে এই গণহত্যা চলে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। এর পরও নিস্তার মেলেনি। পরবর্তী পাঁচদিন ধরে চলে এই গণহত্যা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনেই। এই ঘটনায় নিহত হয় প্রায় ৫০০০ হাজার বাঙালি মুসলমান। যার ৩৫০০ জনই ছিলো শিশু।

ঘটনার আগের ঘটনা

ঘটনার আগে উস্কানিমূলক গুজব শোনা যায়, ওই অঞ্চলের উপজাতি শিশুদের মুসলমানরা তুলে নিয়ে মেরে ফেলেছে। এরকমও সন্দেহ করা হয়, কট্টর হিন্দুবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ক্যাডাররা হামলার নেতৃত্ব দেয়।

ঘটনার তিনদিন আগে কাছের একটি থানা থেকে মেসেজ ওপর মহলে যায়, '... one thousand Assamese villagers [are] getting ready to attack…with deadly weapons'। মেসেজটি ওপর মহল থেকে উপেক্ষা করা হয়। মূলত লালুং উপজাতির লোকেরা আক্রমণ চালায়, সঙ্গে অসমিয়ারা ছিলো।

আসামের মরিরা জেলার একটা আসনে মোহাম্মাদ হোসেন নামের এক স্বতন্ত্র প্রার্থী হেমান্দ্র নারায়ণ নামের এক প্রার্থীকে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। হেমান্দ্র নারায়ণ ২৫ বছর ধরে ওই এলাকা শাসন করে আসছিলেন। এতে করে আরও তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে AGSP। প্রতিশোধ নেশায় পাগল হয়ে যায়। এটিকেও একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

অতঃপর যা হলো

সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো, নেলি গণহত্যার জন্য আজ পর্যন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি, শাস্তি দূরস্তান। পুলিশ চার্জশিট বানিয়েছিলো, পরে সেগুলো বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

১৯৮৩ সালে তিওয়ারি কমিশন নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৪ সালে তার রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করা হয়। তাতে কী লেখা আছে পরের আর কোনো রাজ্য সরকার তা জনগণকে জানায়নি।

গোপনীয়তার ঐতিহ্য আজ পর্যন্ত চলছে। ২০০৪ সালে এক জাপানি গবেষক গৌহাটির অমিয় কুমার দাস ইন্সটিটিউটে নেলির ওপর নথিপত্র পড়তে গেলে রাজ্য সরকার তাকে গ্রেফতার করে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

ইতিহাসের এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে ৬৮৮টি মামলা ফাইল হয় এর মধ্যে ৩৭৮টি মামলা প্রমাণের অভাবে ক্লোজ করা হয় এবং ৩১০টি মামলা

ফাইল হয়। পরে আসাম সরকার সেগুলো ড্রপ করে। একটি মামলারও বিচার হয়নি এবং একজনও শাস্তি পায়নি।
দিনের আলোয় মাত্র ৬ ঘণ্টায় হাজার হাজার নারী-শিশু হত্যাকাণ্ডের এতো বড় ঘটনায় একজনও অভিযুক্ত হয়নি; এটা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো অবিচারের ঘটনা। ইন্ডিয়া কি কোনোদিন এ হত্যাকাণ্ডের দায় থেকে মুক্তি পাবে?

ফ্যাক্টফাইল:

নিহত : ১,৮০০ (সরকারি) প্রায় ৫,০০০ (বেসরকারি)
ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম : ১৪টি
মামলা খারিজ হয়েছে : ৬৬৪টি
মামলা গ্রহণ করা হয়েছে : ৩১০টি
মামলায় অভিযুক্ত : ০ জন
আহতদের ক্ষতিপূরণ : জনপ্রতি ২,০০০ রুপি এবং টিন
নিহতদের ক্ষতিপূরণ : জনপ্রতি ৫,০০০ রুপি

চির স্মরণীয় আত্মত্যাগ
রেশমি রুমাল আন্দোলন

বালাকোটের যুদ্ধ ততোদিনে শেষ হয়ে গেছে। মিইয়ে এসেছে ভারতজুড়ে ইংরেজবিরোধী খণ্ড খণ্ড আন্দোলনের রেশও। এর মধ্যে শুরু হয়ে যায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ। ইংরেজদের নিষ্ঠুরতা আর কূটকৌশলে দমিত হয় সে আন্দোলনও। লাখো মানুষের রক্তস্রোতে বৃটিশ বেনিয়ারা নিশ্চিত করে তাদের মসনদ।

বিদ্রোহের পর এর কারণ অনুসন্ধানে নেমে ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ ও গণঅভ্যুত্থানের জন্য প্রধানত মুসলিম আলেমসমাজকে দায়ি করে এবং আলেমদের দোষী সাব্যস্ত করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন উইলিয়াম লিওর।

এরপর শুরু হয় আলেম নির্যাতনের নির্মম ও দুর্বিষহ অধ্যায়। ভারতজুড়ে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক আলেমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। পর্যায়ক্রমে কালাপানি, সাইপ্রাস, মাল্টা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হয় অনেক জগদ্বিখ্যাত আলেমকে। উনবিংশ শতকের শেষদিকে শুরু হওয়া এ দমন-পীড়ন চলে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল শুরু হয়ে যায়। সারা দুনিয়া বিভক্ত হয়ে পড়ে দুটি আন্তর্জাতিক বলয়ে। ভারতশাসক বৃটিশ আর তাদের মিত্রপক্ষ, অন্যদিকে প্রতিপক্ষে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্ক।

এই সময় শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ.-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী কমিটির একটি বৈঠকে পূর্ব নির্ধারিত দিনে অভ্যুত্থান ঘটানো এবং

তুর্কি ও আফগান সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনার জন্য শায়খুল হিন্দের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

ভারত ছাড়াও প্রবাসে তখন বৃটিশবিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। বৃটিশ সরকারও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নেতৃবৃন্দের ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দেয়। মাওলানা জওহর, আজাদ ও শওকত আলি প্রমূখ ততোদিনে গ্রেফতার হয়ে যান। গ্রেফতারের তালিকায় ছিলেন শায়খুল হিন্দ ও উবায়দুল্লাহ সিন্ধিসহ অনেক আলেম। মাওলানা সিন্ধিকে কাবুলের পথে পাঠিয়ে নিজে গ্রেফতার এড়িয়ে হিজাজের পথে রওয়ানা হন শায়খুল হিন্দ।

উবাইদুল্লাহ সিন্ধিকে কাবুল পাঠানোর কারণ ছিলো অনেকগুলো। এর ভেতর প্রধান কারণ ছিলো তিনটি। প্রথমতঃ গ্রেফতার এড়ানো, দ্বিতীয়ত কাবুল সরকারের সহযোগিতা নিশ্চিত করা, তৃতীয়ত আফগান সীমান্ত জুড়ে দুর্ধর্ষ জাতিগুলোকে সংগঠিত করে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ. হিজাজে যাওয়া জরুরি ভাবলেন দুটো কারণে। তুরস্ক কর্তৃক ভারত অভিযানের চুক্তি চূড়ান্ত করা এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ভারতে ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা উদ্ধারের অভ্যুত্থান সফল করা।

উবাইদুল্লাহ সিন্ধি কাবুল পৌঁছে অসংখ্য স্বাধীনতাকামী ভারতীয়কে দেখতে পান। তিনি একটি 'অস্থায়ী ভারত সরকার' প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা খুঁজে পান। তুর্কি-জার্মান মিশনের সমন্বয়কারী প্রতিনিধি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে এই সরকারের রাষ্ট্রপতি, বরকতুল্লাহকে প্রধানমন্ত্রী, উবাইদুল্লাহ সিন্ধি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নেন। এই সরকারে তুর্কি-জার্মানও ছিলো।

১৮ সেপ্টেম্বর নাগাদ শায়খুল হিন্দ বোম্বাই-জিদ্দা হয়ে অক্টোবরে মক্কা পৌঁছান। হিজাজের গভর্নর গালিব পাশা শাইখুল হিন্দের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে দুটি চিঠি লিখেন। একটি ছিলো ভারতবর্ষ ও তার অঞ্চল ঘেঁষে আফগান গোত্রপতি মুসলমানদের প্রতি। এতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান ছিলো। ইতিহাসে এই চিঠিকে 'গালিব নামা' নামে আখ্যায়িত করা হয়। অপর চিঠির বিষয় ছিলো

আফগান সরকারের প্রতি শায়খুল হিন্দের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা মতো আফগান ভূখণ্ড দিয়ে তুর্কি সৈন্য চলাচলের অনুরোধ।

শায়খুল হিন্দ মদিনায় পৌঁছে জানতে পারেন, আনোয়ার পাশা রওজা মোবারক জিয়ারতে আসছেন। তাই তাকে তুরস্কে যেতে হবে না। মদিনায় বসেই সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে। কার্যত হলোও তাই। আনোয়ার পাশার পক্ষ থেকে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সহায়তার আশ্বাস নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আনোয়ার পাশা শাইখুল হিন্দকে তিনটি পত্র লিখে দিলেন। এর একটি অস্থায়ী ভারত সরকার ও তুর্কি সরকারের মধ্যকার চুক্তিনামা। দ্বিতীয়টি মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি শায়খুল হিন্দকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান। তৃতীয় পত্রটি ছিলো আফগান সরকারে প্রতি। এর বিষয়বস্তু ছিলো আফগান সরকারের সম্মতিতে তুর্কিবাহিনীর ভারত অভিযানের কথা।

সিদ্ধান্ত ছিলো আফগান সরকার সম্মত থাকলে তুর্কিবাহিনী আফগান সীমান্তে অবস্থান নেবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ সালে তারা ভারত প্রবেশ করবে এবং ভারতের ভেতর গণঅভ্যুত্থান ঘটাবে।

যথারীতি সিদ্ধান্ত মোতাবেক হিজাজ থেকে প্রদত্ত পত্রটি কাবুলে অবস্থিত অস্থায়ী ভারত সরকারকে পৌঁছানো হলো। উবায়দুল্লাহ সিন্ধির নেতৃত্বে এই চিঠি নিয়ে আফগান বাদশাহ হাবিবুল্লাহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ে চাপের কথা তুলে সম্মতিদানে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। অবশ্য বাদশাহ'র অন্যান্য মিত্র এবং জনগণ ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রতি আন্তরিক ছিলেন। শেষ নাগাদ একটি চুক্তি হলো, আফগান সরকার নিরপেক্ষ থাকবে। তবে তুর্কীবাহিনী আফগান সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করবে। আফগান সরকার কোনো আফগানী ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে যেতে চাইলে আপত্তি তুলবে না। তবে ইংরেজদের কৈফিয়ত দেবে এই বলে যে, সীমান্তে উপজাতিদের বিদ্রোহে বেসামাল হয়ে তারা তুর্কিবাহিনী ঠেকাতে পারেনি।

উবাইদুল্লাহ সিন্ধি এ সিদ্ধান্ত ভারতে অবস্থানরত জানাতে বিশ্বস্ত সঙ্গী মৌলভি আব্দুর রহিমের কাছে পত্র দিয়ে পাঠান। গোপনীয়তা রক্ষার্থে

লেখাগুলো একটি রেশমি রুমালে সুতা দিয়ে লিখে বিশেষ ব্যবস্থায় আব্দুর রহিমকে দেয়া হয়।

কিন্তু আফগান বাদশাহ আমির হাবিবুল্লাহ খান তার কথা রাখেননি। তিনি বিশাল অঙ্কের আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে তথ্যটি ইংরেজ সরকারের কাছে ফাঁস করে দেন। বৃটিশ গোয়েন্দা পুলিশ পত্রবাহক আব্দুর রহিমের বাড়ি তল্লাশি করে রুমালটি উদ্ধার করে ফেলে। আব্দুর রহিম আত্মগোপন করে পালিয়ে যান। কথিত আছে, এই আত্মগোপন থেকে আমৃত্যু তিনি আর লোকসমাজে ফিরে আসেননি।

কিছু লোভী আর স্বার্থবাজ মানুষের কারণে ব্যর্থ হয় রেশমি রুমাল আন্দোলন। সেই সঙ্গে নির্বাপিত হয় ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেকটি মশাল। আন্দোলনের প্রধান নেতা শাইখুল হিন্দ তার প্রিয়ছাত্র হোসাইন আহমদ মাদানিসহ হেজাজে গ্রেফতার হন এবং তাদেরকে মাল্টায় নির্বাসন দেয়া হয়। আর উবাইদুল্লাহ সিন্ধিকে অনেকগুলো বছর নানা দেশে দেশে আত্মগোপন করে বেড়াতে হয় পথহারা মুসাফিরের মতো। ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয় আরেকটি বেদনাবহ অধ্যায়।

ঢাকার দলিল

শাহবাগের ইতিহাস

যদিও ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিলো সপ্তম শতাব্দীর দিকে, কিন্তু শাহবাগে শহুরে স্থাপনার প্রমাণ পাওয়া যায় কিছু স্মৃতিস্তম্ভ থেকে, সেগুলো ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের পরের। সেসময় মোঘল সম্রাট ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং শাহবাগে বেশ কিছু সুরম্য বাগান গড়ে তোলেন।

স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে রয়েছে ঢাকা গেট, যা বর্তমানে শাহবাগে বাংলা একাডেমির কাছে অবস্থিত। স্তম্ভটি বাংলার মোঘল সুবাদার মির জুমলা তৈরি করেছিলেন, যিনি ১৬৬০ সাল থেকে ১৬৬৩ সাল পর্যন্ত বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরিয়ম সালেহা মসজিদ, নীলক্ষেত-বাবুপুরায় অবস্থিত একটি তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মোঘল ধাঁচের মসজিদ, যা নির্মাণ করা হয়েছিল ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশের মুসা খানের মসজিদ, যা ১৭ শতকে তৈরি বলে মনে করা হয় এবং খাজা শাহবাজের মসজিদ-মাজার, যা ঢাকা হাইকোর্টের পেছনে অবস্থিত এবং ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে খাজা শাহবাজ কর্তৃক নির্মিত।

মোঘল শাসনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শাহবাগের বাগানগুলো অযত্ন ও অবহেলার শিকার হয়। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয় তখন এ সম্পত্তির মালিক হন নায়েব নাজিম, যিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রতিনিধি এবং পূর্ববাংলার প্রদেশিক ডেপুটি-গভর্নর ছিলেন। ১৭৫৭ সাল থেকে ঢাকায় বৃটিশ শাসন শুরু হলেও, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জেলা প্রশাসক গ্রিফিথ কুকের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহবাগের বাগানগুলো ১৯ শতকের শুরু পর্যন্ত টিকে

ছিলো। ঢাকার আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের নেতা পি আরাতুন এই কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

১৮৩০ সালে জেলা কালেক্টর হেনরি ওয়াল্টারের ঢাকা শহর উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত ঢাকা কমিটির বিচক্ষণতায় শাহবাগসহ রমনা এলাকাকে ঢাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রায় এক যুগ পরে, ঢাকার নবাব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা এবং নবাব খাজা আবদুল গনির পিতা নবাব আলিমুল্লাহ, শাহবাগের জমিদারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে কিনে নেন। ১৮৬৮ সালে তার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি তার দৌহিত্র স্যার নবাব খাজা আহসানুল্লাহর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ২০ শতকের শুরুর দিকে আহসানুল্লাহর পুত্র, স্যার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ শাহবাগের বাগানকে ছোট দুই ভাগে ভাগ করে বাগানগুলোর হারানো সৌন্দর্যের কিছু অংশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। বর্তমানে যা শাহবাগ এবং পরীবাগ নামে রয়েছে। আহসানুল্লাহর এক কন্যা পরীবানুর নামে এর নামকরণ করা হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা পূর্ববাংলার নতুন প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় পুরো ঢাকা, বিশেষ করে নবনির্মিত ফুলার রোডের (পূর্ববাংলার প্রথম প্রতিনিধি গভর্নর স্যার মাম্পফিল্ড ফুলারের নামে নামকরণ) পাশ দিয়ে দ্রুত ইউরোপীয় ধাঁচের দালান-কোঠা তৈরি হতে থাকে। এ সময়েই ঢাকার শাহবাগে প্রথম চিড়িয়াখানা চালু হয়।

নবাব পরিবারের জনপ্রিয় দালানগুলোর মধ্যে ছিলো ইসরাত মঞ্জিল। মূলত, নৃত্যপারঙ্গম বাইজিদের (বাইজিদের মধ্যে পিয়ারি বাই, ওয়ামু বাই, আবেদি বাই খুবই জনপ্রিয় ছিলেন) নাচার জন্য নাচঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে এ দালানটি নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের স্থান হিসেবে পরিণত হয়, যাতে প্রায় ৪,০০০ অংশগ্রহণকারী অংশ নেয়।

১৯১২ সালে সংগঠনটি খাজা সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে আবার সভা ডাকে এবং তারা ভিক্টোরি অব ইন্ডিয়া চার্লস হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করে। ইসরাত মঞ্জিল পুনর্নির্মাণ করে হোটেল শাহবাগ করা হয়, যা ঢাকার প্রথম প্রধান আন্তর্জাতিক হোটেল। ১৯৬৫ সালে ভবনটি ইনস্টিটিউট অব পোস্ট-

গ্রাজুয়েটে মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ অধিগ্রহণ করে এবং পরর্তীতে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা অধিগৃহীত হয়।

আরেকটি নবাব দালান হলো জলসাঘর। তৈরি হয়েছিলো নবাবদের স্ক্যাটিং এবং বলনাচের স্থান হিসেবে। পরবর্তীতে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের খাওয়া এবং আড্ডার স্থান হিসেবে পরিণত হয় এবং নামকরণ করা হয় মধুর ক্যান্টিন বলে। ১৯৬০-এর শেষের দিকে মধুর ক্যান্টিন পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্রদের একটি মিলনস্থান হিসেবে, যার একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ এবং অন্যদিকে আইবিএ রয়েছে। মধুর ক্যান্টিন শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতীক হয়ে এখনও বিদ্যমান।

নিশাত মঞ্জিল তৈরি করা হয়েছিলো নবাবদের আস্তাবল এবং ক্লাব হাউস হিসেবে এবং তৎকালীন কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গের আপ্যায়নস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। খাজা সলিমুল্লাহ তার বোন পরীবানুর স্মরণে তৈরি করেছিলেন নবাবদের পরীবাগ হাউস। পরবর্তীতে পরিবারের খারাপ সময়ে তার পুত্র নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ এখানে অনেক বছর বসবাস করেছিলেন। এখানকার হাম্মাম (গোসলখানা) এবং হাওয়াখানা (সাজঘর) বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর কীর্তি হিসেবে মনে করা হয়।

অত্র এলাকায় নবাবদের সবচেয়ে পুরাতন ভবন ছিলো সুজাতপুর প্যালেস, যা পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব-বাংলার গভর্নরের বাসভবনে রূপান্তর করা হয়। আরও পরে এটি বাংলাদেশে, বাংলা ভাষাবিষয়ক সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বাংলা একাডেমিতে পরিবর্তিত হয়। প্যালেসের বেশকিছু এলাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলনকেন্দ্রের (টিএসসি) জন্য হস্তান্তর করা হয়। ১৯৭০ সালে এটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়।

কভু ভোলবার নয়

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

১৯৬৭ সালের ৬ দিনব্যাপী আরব-ইসরাইল যুদ্ধকে উভয়পক্ষের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধ বলে মনে করা হয়। ওই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গোরিওন বহু বছর আগে বলেছিলেন, ইসরাইল যে যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সবার জানা উচিত। এ ছাড়া ইসরাইলের জন্য যে সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে তেলআবিব কোনোদিনও সন্তুষ্ট থাকবে না, বরং মিসরের নীলনদ থেকে ইরাকের ফোরাত পর্যন্ত এ রাষ্ট্র বিস্তৃত হবে।

বেন গোরিওন মনে করতেন, ইহুদিবাদী সেনারা যতোখানি ভূখণ্ড দখল করতে পারবে, সে পর্যন্ত ইসরাইলের সীমানা বিস্তৃত হবে। কাজেই ইসরাইলের সীমান্ত চারদিকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের ৫ জুন ইসরাইল মিসর, সিরিয়া, জর্দান ও ইরাকের বিমানবন্দরগুলোতে একযোগে হামলা চালায় এবং ওই অকস্মাৎ হামলায় সামরিক দিক দিয়ে ওই চার আরব দেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আরব দেশগুলো ইসরাইলি হামলা প্রতিরোধ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিন বিমান হামলা করে ইসরাইল আরব দেশগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। স্থলযুদ্ধেও ইসরাইল মার্কিন সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিসরের সিনাই মরুভূমি, সিরিয়ার গোলান মালভূমি, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর, বাইতুল মোকাদ্দাসের পূর্ব অংশ এবং গাজা উপত্যকা দখল করে নেয়।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিম তীর ও পূর্ব বাইতুল মোকাদ্দাস জর্দানের নিয়ন্ত্রণে এবং গাজা উপত্যকা মিসরের অধীনে

ছিলো। ইহুদিবাদী সরকার এসব ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখলের মাধ্যমে নিজের জবর দখলকৃত এলাকাকে তিনগুণে উন্নীত করে। মিসর ও সিরিয়ার কিছু অংশ ছাড়াও গোটা ফিলিস্তিন ইসরাইলের দখলে চলে যায়। ফলে জাতিসংঘের প্রস্তাবে মাত্র ৪৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড নিয়ে যে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার কথা ছিলো, সে সম্ভাবনাটুকুও বিলীন হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের যুদ্ধে ইসরাইলের ভৌগলিক মানচিত্রের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পুরোপুরি পাল্টে যায়।

ইহুদিবাদীদের মতে, জাতিসংঘ গোটা ফিলিস্তিন তাদের না দিয়ে ওই ভূখণ্ড দ্বিখণ্ডিত করে যে ভুল করেছিলো, '৬৭ সালের যুদ্ধের মাধ্যমে সে ভুল সংশোধন করা হয়েছে। ওই যুদ্ধের আগে ইসরাইলের আয়তন ছিলো ২০ হাজার ৬৯৯ বর্গকিলোমিটার এবং শহরগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ইসরাইলের মানচিত্রও ছিল অনেকটা এবড়োথেবড়ো। এ কারণে ইসরাইলি কর্মকর্তারা জবর দখলের মাধ্যমে তাদের মানচিত্রের এই অসামঞ্জস্য দূর করার চেষ্টা করছিলো।

সে সময় ইসরাইলের শতকরা ৮০ ভাগ নাগরিক তেলআবিব ও এর আশপাশে ভূমধ্যসাগরের তীরে বসতি গড়ে তুলেছিলো। তবে তাদের বসতিগুলো ছিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও খাপছাড়া। এ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ইসরাইলিরা নিজেদের ভূমধ্যসাগর ও জর্দানের মধ্যবর্তী সরু একটি এলাকার মধ্যে অবরুদ্ধ বলে মনে করতো এবং এজন্য তারা উদ্বিগ্নও ছিলো।

অন্যদিকে বাইতুল মোকাদ্দাসের দুই অংশকে একত্র করা ছিলো ইসরাইলের আরেকটি মনোবাসনা। ১৯৪৮ সালে ইহুদিবাদী সরকার বাইতুল মোকাদ্দাসের পশ্চিম অংশ দখল করে নেয় এবং এর ১৯ বছর পর ওই ঐতিহাসিক নগরীর পূর্ব অংশ দখলের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসা করায়ত্ত করার জন্য পূর্ব বাইতুল মোকাদ্দাস দখল করার প্রয়োজন ছিলো। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইহুদিবাদীদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। এ সময়েও সারাবিশ্ব থেকে ইহুদিদের ইসরাইলে এসে স্থায়ী বসতি গড়ার জন্য উৎসাহিত করার কাজ অব্যাহত থাকে।

এদিকে ইসরাইলিরা সে সময় অন্য যে সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, তা হলো সিরিয়ার গোলান মালভূমি। গোলান মালভূমির কৌশলগত অবস্থান, বিশেষ করে বৈরুত ও দামেস্কের সঙ্গে এর সংযোগ থাকায় ইহুদিবাদীরা ফিলিস্তিন জবরদখলের শুরু থেকে ওই মালভূমি খালের সুযোগ খুঁজতে থাকে। ইসরাইলের সীমানা বৃদ্ধির পাশাপাশি গোলান মালভূমি বা পার্বত্য এলাকার সুমিষ্ট পানির উৎস দখল করাও ছিলো ইহুদিবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৭ সালের জুন মাসের যুদ্ধে ইসরাইল এক ঢিলে বহু পাখি শিকার করে।

এদিকে ১৯৬৭ সালের ২৪ নভেম্বর আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ৪ মাস পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২ নম্বর প্রস্তাব পাস করে। জাতিসংঘ ওই প্রস্তাবে গোলান মালভূমি, সিনাই মরুভূমি, পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা ও পূর্ব বাইতুল মোকাদ্দাসকে অধিকৃত ভূখণ্ড বলে উল্লেখ করে এবং এসব এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করার জন্য ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানায়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, জাতিসংঘ একবার ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দ্বিখণ্ডিত করে সেখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চরম অবিচার করেছিলো। এরপর সংস্থাটি ১৯৬৭ সালে ২৪২ নম্বর প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার হরণের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ভুল ও অন্যায় করে।

১৯৪৭ সালের ১৮১ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী ফিলিস্তিনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এর ৫৫ ভাগ ইহুদিবাদীদের দেয়া হয়েছিলো। আর ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল বাকি ৪৫ ভাগ এলাকাও দখল করে নিয়েছিলো। মোট ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের মাত্র ২০ শতাংশ এলাকা জুড়ে ছিল গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর ও পূর্ব বাইতুল মোকাদ্দাস। ফলে দেখা যাচ্ছে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৬৭ সালে ২৪২ নম্বর প্রস্তাব পাস করে গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর ও পূর্ব বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে কার্যত শতকরা ৮০ ভাগ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে বৈধভাবে ইসরাইলকে দিয়ে দেয়, যার পরিমাণ ১৯৪৭ সালের জাতিসংঘের প্রস্তাবেই ছিলো ৫৫ ভাগ।

১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধে পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা ও পূর্ব বাইতুল মোকাদ্দাসের আরও ৩ লাখ ৭০ হাজার ফিলিস্তিনি শরণার্থীতে পরিণত হয়। সিরিয়ার গোলান মালভূমি থেকে এক লাখ সিরিয়া নাগরিক এবং মিসরের সিনাই মরুভূমি থেকে আরও হাজার হাজার মিসরীয় নাগরিকও তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হয়।

ইহুদিবাদী ইসরাইল নব্য দখলকৃত এলাকাগুলোতে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য নতুন নতুন বসতি গড়ে তুলে সারাবিশ্ব থেকে আরও হাজার হাজার ইহুদিকে ধরে এনে এসব বসতিতে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। এরপর ইসরাইলের সঙ্গে আরবদের বড় ধরনের কোনো যুদ্ধ না হলেও ইহুদিবাদী সরকার এখনও মধ্যপ্রাচ্যের সকল সংকটের কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গেছে।

বারোভূঁইয়ার বীর

মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁ

মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের শাসন-দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শেরশাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন। পাঁচ বছর ভারতবর্ষ শাসন শেষে কালীগঞ্জের দুর্গের বারুদখানায় আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটলে শেরশাহ ৯৫২ হিজরির ১১ রবিউল আউয়াল (১৫৪৫ সালের ২৩ মে) মৃত্যুবরণ করেন। শেরশাহের মৃত্যুর পর জালাল খান ওরফে সেলিম খান ইসলাম শাহ নাম ধারণ করে ভারত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।

তার শাসনামলে ভাটির শাসক সোলায়মান খাঁ (ঈসা খাঁর পিতা) নামে একজন আঞ্চলিক জায়গিরদার প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কুর শাসিত দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করেন। তিনি জবরদখলকারী আফগানদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করেন। ১৫৪৬-৪৭ সালের দিকে তিনি চূড়ান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঢাকা ও ময়মনসিংহের উত্তর-পূর্ব দিকে ভাটি অঞ্চলের একটি অংশে তার স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তাকে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য দিল্লিসম্রাট সেলিম খানের আমলে তাজ খাঁ ও দরিয়া খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরিত হয়। সোলায়মান খানের সঙ্গে দুই মোঘল সেনাপতির দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তিনি সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করলেও কিছুদিন পর আবারও বিদ্রোহ করেন।

কোনোভাবেই সোলায়মান খাঁকে পরাভূত করতে না পেরে মোঘল সেনাধ্যক্ষদ্বয় হীন কূটচালের আশ্রয় নেন। তারা সমঝোতার কথা বলে সোলায়মান খাঁকে কৌশলে ডেকে এনে হত্যা করেন। পরবর্তীতে সোলায়মান খাঁর হন্তারক ও সেলিম খানের অধীনস্ত সেনাপতি তাজ খাঁ কররানি রাজনৈতিক পালাবদলে বাংলার সিংহাসন দখল করে নেন।

ইতোমধ্যে রাজ নির্দেশে সোলায়মান খাঁকে হঠকারী ও কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করায় তার মধ্যে অনুশোচনা জাগ্রত হয়। ফলে তার দরবারে সোলায়মান খাঁর ভ্রাতা ও ঈসা খাঁর চাচা কুতুব খাঁকে উচ্চপদে নিয়োগ দিয়ে তার গ্লানির কিছুটা অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হন। কুতুব খাঁর অনুরোধেই তাজ খাঁ ঈসা খাঁকে ভাটি অঞ্চলের পৈত্রিক জমিদারি জায়গির হিসেবে ফেরত দান করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, ঈসা খাঁ ১৫৬৩-৬৪ সালের দিকে তার পৈত্রিক জমিদারি ফেরত পেয়েছিলেন।

ঈসা খাঁর পিতা প্রথমে ছিলেন হিন্দু। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুস্তান থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করতে বাংলাদেশে আসেন। পরে তিনি মুসলমান হয়ে কালিদাস গজদানি নাম পরিবর্তন করে সোলায়মান খাঁ নাম ধারণ করেন। তার টাকা-পয়সা ও বিত্ত বৈভব ছিলো প্রচুর। পরবর্তীতে তিনি বঙ্গে অন্যতম জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

ঈসা খাঁ পিতৃরাজ্য ফেরত পেয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যে নিজেকে একজন দক্ষ সমরনায়ক ও দূরদর্শী জমিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঈসা খাঁ নিজ জমিদারি শাসনের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে নিজ শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি অত্যাল্প সময়ের মধ্যেই তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন এবং বাংলার অন্যান্য শাসকদের নিজ আয়ত্বে নিয়ে আসেন।

মোঘল শাসক হুমায়ুনের সিংহাসনচ্যুতি এবং কুরু বংশীয় শাসন পরবর্তীকালে দিল্লির সিংহাসনে বসেন জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর। তার শাসনামলে ভারতের প্রায় সব বিস্তীর্ণ এলাকা তার শাসন কর্তৃত্বে এলেও সুবা বাংলাকে তিনি পুরোপুরি কব্জা করতে পারেননি। তখন এ বাংলা প্রদেশে বারোজন প্রায় স্বাধীন সামন্ত শাসক সম্মিলিতভাবে মৈত্রীজোট গঠন করে নিজ নিজ এলাকা শাসন করতেন। এদের নেতা ছিলেন বীর ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা। প্রচুর ক্ষমতাধর এই জমিদারশ্রেণী ইতিহাসে 'বারো ভূঁইয়া' নামে খ্যাত ছিলেন। সোনারগাঁও থেকে জঙ্গলবাড়ী, সরাইল থেকে রংপুর ছিলো বারো ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁর শাসন এলাকা।

সোনারগাঁও পরগনার পাঠান জমিদার ইবরাহিম নাড়াল ও মহেশ্বরদী পরগনার জমিদার করিমদাদ মুসাজাই মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করেন। মোঘল সেনাপতি হোসেনকুলি বেগ ভাওয়াল অভিযানে এলে এসব বিদ্রোহী মোঘল আধিপত্য মেনে নেন। কিন্তু ঈসা খাঁ মাথা নত করেননি। বর্তমান কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের কাস্তল, জঙ্গলবাড়ী, গাজীপুরের কালীগঞ্জের বক্তারপুর, টোক, নারায়ণগঞ্জ জেলার কাতরাব খিজিরপুর প্রভৃতি স্থানে মোঘলদের সঙ্গে ঈসা খাঁর যুদ্ধ হয়।

সর্বশেষ ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জের এগারসিন্দুরে ব্রহ্মপুত্র তীরের প্রান্তরে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে তার বীরবিক্রমে যুদ্ধ হয়। কথিত আছে, যুদ্ধে বীর ঈসা খাঁ জয়ী হলেও মানসিংহকে হত্যা না করে ঈসা খাঁ নিরস্ত্র মানসিংহকে নিজের তরবারি দিয়ে পুনরায় যুদ্ধ শুরুর আহ্বান জানান। কিন্তু মানসিংহ যুদ্ধ শুরু না করে ঈসা খাঁর মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ না করে আলিঙ্গন করেন।

ঈসা খাঁ ও মানসিংহের মাঝে এক মর্যাদাপূর্ণ সন্ধি হয়। মানসিংহ দিল্লির দরবারে ফিরে গিয়ে বিষয়টি অবগত করলে সম্রাট আকবর ঈসা খাঁকে ২২টি পরগনা আগের মতো শাসন করার অনুমতি প্রদান করেন। এই ২২ পরগনার শাসক এবং বাংলার স্বাধীনতাকামী বীর ঈসা খাঁ ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ তারিখে বক্তারপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

যে কোনো কারণেই হোক ইতিহাসের কোথাও ঈসা খাঁর সমাধিস্থলের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। অনেকে পারুলিয়াতে অবস্থিত ঈসা খাঁর প্রপৌত্র শরীফ খাঁর সমাধিস্থলকেই ঈসা খাঁর সমাধি মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে কালীগঞ্জের বক্তারপুরে ঈসা খাঁ ও নিকটবর্তী পলাশ থানার পারুলিয়াতে শরীফ খাঁর সমাধিস্থল অবস্থিত। গত শতাব্দীতে দীর্ঘ অনুসন্ধান করার পর একাধিক প্রমাণ সাপেক্ষে বক্তারপুরে ঈসা খাঁর সমাধি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। ঈসা খাঁর সমাধির পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর পার্শে ঘাটের আলামতসহ তিনটি বড় দিঘীর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন তথ্যসূত্রে বীর ঈসা খাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ৭ জন পুত্রসন্তানের কথা জানা যায়। তারা হলেন, মুসা খাঁ, মাহাম্মদ খাঁ, ইলিয়াস খাঁ, আবদুল্লাহ খাঁ, দাউদ খাঁ, বিরহিম খাঁ ও বিরাম খাঁ। তাঁদের পাঁচজন প্রথমা স্ত্রী সৈয়দ ইবরাহিম মালেকুল ওলামার কন্যা সৈয়দা ফাতেমা

খাতুনের এবং শেষ দুজন কেদার রায় দুহিতা সোনামণি ওরফে অলি নেয়ামত খানমের গর্ভজাত।

ঈসা খাঁ ফাউন্ডেশনের সভাপতি হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন ঈসা খাঁর বংশধর নাসিমা আক্তার রত্না।

তথ্যসূত্র :

১. *আকবরনামা, ভলিউম ৩ : আবুল ফজল কর্তৃক রচিত*
২. *তারিখে শেরশাহী : আব্বাস খান শেরওয়ানী রচিত*
৩. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ড. এমএ রহিম রচিত*
৪. *দেওয়ান ঈসা খাঁ : মোঃ মতিউর রহমান রচিত*
৬. *ময়মনসিংহের ইতিহাস : কেদারনাথ মজুমদার রচিত*
৫. *সিলেটের আলাপ.কম*

ইতিহাসের ইতিহাস
সুয়েজ খালের পেছনের গল্প

প্রাগৈতিহাস

প্রায় তিন হাজার বছর আগের ঘটনা। ফারাও নেকো তখন মিসরের অধিপতি। শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত এ ফারাও একবার ঘোষণা দিলেন, তিনি আর যুদ্ধ বিগ্রহ করবেন না। সুতরাং তার হামলাদার কোনো নৌবহরেরও দরকার নেই। তাহলে এতোদিন ধরে গড়ে তোলা তার বিশাল নৌবাহিনীকে কী কাজে লাগাবেন?

একদিন হঠাৎ করেই ফারাও তার পূজ্য দেবীর পক্ষ থেকে স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন একটি খাল খননের; যেটি একত্রিত করবে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যকে। তার নৌবাহিনী কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই শাসন করতে পারবে আরব, পারস্য এবং দূরপ্রাচ্য। তিনি এ খাল খননের মধ্য দিয়ে মূলত দূর করতে চেয়েছিলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের দূরত্ব।

শুরু হলো খাল খনন। কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই ফারাও নেকো হন্তদন্ত হয়ে ঘোষণা করলেন, বন্ধ করো খাল খনন। কারণ উপাস্য দেবীর কাছ থেকে তিনি আবার স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছেন, এ খাল দিয়েই একদিন মিসরে ঢুকবে মিসরের শত্রুরা। সুতরাং অর্ধেক খনন হয়ে বন্ধ হয়ে গেলো খাল খননের মহাযজ্ঞ। কালের আবর্তে ঢাকা পড়ে গেলো ফারাও নেকোর প্রচেষ্টা। সময়ের পালাবদলে সেই অর্ধেক খনন করা খালটিও চাপা পড়ে গেলো ধীরে ধীরে। একটা সময় মানুষ আর সেটার কোনো নাম নিশানাই ঠিক পেলো না।

এরপর কেটে গেছে প্রায় তিন হাজার বছর। ইতিহাসের অনেক পালাবদল হয়েছে এ তিন হাজার বছরে। অনেক যুদ্ধ আর রক্তগঙ্গা স্নাত করেছে

মিসরের মাটিকে। তবু সে খাল খননের কথা কেউ ভুলেও উচ্চারণ করেনি।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে জলপথে সংযোগ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুততর করার বিষয়টি আলোচনায় আসে ফের। কারণ ততোদিনে আরব এবং ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসায়িক এবং বৈষয়িক বিভিন্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। এ কারণে ইউরোপ ও আরবের মধ্যে ত্বরিত যোগাযোগের জন্য একটি খাল বা নৌপথ নির্মাণ আবশ্যক হয়ে পড়ে।

এরপর মিসর অভিযানে আসেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তিনিই প্রথম ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে লোহিত সাগরের সংযোগ করার বাণিজ্যিক গুরুত্ব বুঝতে পারেন। মিসর অভিযানে নেপোলিয়নের সহযাত্রী ইঞ্জিনিয়ার লেপিরে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। কিন্তু জরিপে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের চেয়ে লোহিত সাগর ১০ মিটার উঁচু। ফলে এ পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়।

নতুন ইতিহাস

১৮৫৪ সালের ১৫ নভেম্বর। মিসরের তৎকালীন শাসনকর্তা খেদিভ সৈয়দ পাশার দরবারে প্রবেশ করলেন এক ফরাসি তরুণ। তার নাম ফার্দিন্যান্দ দ্য লেসেপ্স। তিনি কায়রোস্থ ফরাসি রাষ্ট্রদূতের ছেলে। সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান। তিনি গভর্নরের জন্য একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মাঝে ব্যবসায়িক সেতুবন্ধন হিসেবে খনন করতে চান একটি খাল। গভর্নর তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং মুগ্ধ হলেন তার ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে। খেদিভ রাজি হলেন। ১৮৫৪ সালের ৩০ নভেম্বর খেদিভ সৈয়দ পাশা লেসেপ্সকে সুয়েজ জলপথের জন্য দিলেন নিরানব্বই বছরের এক সনদ।

সুয়েজ খাল খনন করতে ১৮৫৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর সুয়েজ খাল কোম্পানি গঠন করা হয়। সে সময় এ কোম্পানির মোট মূলধন ছিলো ২০ কোটি ফ্রাঁ। বেশ কিছু শর্ত নিয়ে কাজ শুরু করে এ কোম্পানি। খাল খননের প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির পাঁচ ভাগের চার ভাগই মিসর সরকারকে সরবরাহ করতে হয়। খালের উভয় তীরে দুই কিলোমিটার জমি কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করতে হয়। এছাড়া জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে

সুয়েজ খালকে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং চুক্তির মেয়াদ ৯৯ বছর নির্ধারণ করা হয়।

সৈয়দ পাশা মারা যাওয়ার পর মিসরের গভর্নর হন ইসমাইল। তিনি কোম্পানির কঠিন শর্ত পছন্দ করতেন না। ২০ হাজার শ্রমিকের পরিবর্তে তিনি মাত্র ছয় হাজার শ্রমিক সরবরাহের কথা বলেন। এটি নিয়ে ইসমাইল এবং কোম্পানির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। অবশেষে ইসমাইলকে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে এ বিরোধের মীমাংসা হয়। বিবাদ মীমাংসার পর খাল খননের কাজ দ্রুত চলতে থাকে। ১৮৬৮ সালের মধ্যে খাল খননের কাজ সম্পন্ন হয়। ১৮৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর সুয়েজ খালকে চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। তবে ১৮৬৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর সুয়েজ খাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

সুয়েজ খাল খননের শুরু থেকেই বৃটিশ সরকার নানাভাবে এ খনন কাজের বিরোধিতা করেছে। এর প্রধান কারণ ফরাসিদের উদ্যোগে প্রস্তাবিত সুয়েজ খালকে তারা তাদের পরাজয় বলে ভেবে নিয়েছিলো। কেননা উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশরাই ছিলো পৃথিবীর সবচে বড় পরাশক্তি। তাদেরকে টেক্কা দেয়ার জন্য ছিলো ফরাসি, ডাচ, পর্তুগিজরা। এ কারণে বৃটিশদের নজরানা না দিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনো বড় কাজ হলে তারা সেটাকে বরদাশত করতে পারতো না।

তবে বৃটিশরা একপর্যায়ে গিয়ে সুয়েজ খালের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। সেটা সুয়েজ খাল খননের শেষের দিকে। বৃটিশরা নানা দিক বিবেচনা করে সুয়েজ খালের শেয়ার নেয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। ১৮৭৫ সালে এ সুযোগটি আসে। আর্থিক সমস্যার কারণে শাসক ইসমাইল নিজের শেয়ার বিক্রি করতে বাধ্য হন। এ শেয়ার কিনে নেন বৃটিশ শিল্পপতি রথচাইল্ড। এ শেয়ার কেনার মাধ্যমে বৃটিশরা সুয়েজ খালের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

সুয়েজ সঙ্কট

১৯৫৬ সালে ইজিপ্টের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করেন। এটি করা হয় ব্রিটেন এবং আমেরিকার আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে সাহায্য প্রত্যাহার করার পরের

প্রেক্ষাপটে। কিন্তু এটিই ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সঙ্কট তৈরি করে। তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইসরাইলের যৌথ সেনাবাহিনী ইজিপ্ট দখল করে নেয়। ১৯৫৬ সালের ৪ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্র শান্তির পক্ষে মত দেয়। অপরদিকে আমেরিকা অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্রিটেনের ওপর চাপ দেয়। অবশেষে এ যৌথ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। এ সুয়েজ সঙ্কটের কারণেই ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সুয়েজ খাল বন্ধ রাখা হয়।
১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরও সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ৫ জুন পর্যন্ত এ খালে চলাচল বন্ধ থাকে।

সুয়েজ খালের গুরুত্ব

কৌশলগতভাবে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাল হচ্ছে সুয়েজ খাল। ১৯৫৫ সালের দিকেই ইউরোপের মোট তেলের দুই-তৃতীয়াংশই সুয়েজ খাল দিয়ে পরিবহন করা হতো। বর্তমানে বিশ্বের সমুদ্র বাণিজ্যের শতকরা ৭.৫ ভাগই সুয়েজ খালের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মিসর সুয়েজ ক্যানেল অথরিটি (এসসিএ) এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৩ সালেই ১৭ হাজার ২২৪টি জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে পার হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর শিপিং ট্রাফিকের শতকরা ৮ ভাগই হয়েছে খালটি দিয়ে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৫-এর জুলাই থেকে ২০০৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ৩.২৪৬ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে সুয়েজ খাল থেকে। এসব পরিসংখ্যানই সুয়েজ খালের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়।

লর্ড রবার্ট ক্লাইভ
মৃত্যুও যাকে ক্ষমা করেনি

লর্ড ক্লাইভ। নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছুই নেই। মীর জাফরের নাম শুনলেই যেমন একজন বিশ্বাসঘাতকের মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে, তেমনি লর্ড ক্লাইভের নাম শুনলেই একজন কুচক্রী ইংরেজের মুখাবয়ব ভেসে ওঠে আমাদের বাঙালিমানসে। ইংরেজদের এদেশে আগমন, বাণিজ্যকুঠি স্থাপন, বাংলার নবাবদের কাছে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা চাওয়া এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে মীর জাফরের সঙ্গে আঁতাত ও পলাশী। এর পরের ইতিহাস কেবলই বেদনা আর দুঃশাসনের। বেদনা ও দুঃশাসন যার হাত ধরে আসে, তার নামই লর্ড রবার্ট ক্লাইভ।
১৭২৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ছোট শহর সওর্পশায়ারে ইতিহাসের ঘৃণিত নায়ক রবার্ট ক্লাইভের জন্ম। বাবা ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। ১৩ ভাইবোনের মধ্যে সে ছিলো সবার বড়। ছেলেবেলা থেকেই সে ছিলো খুবই দুষ্টু প্রকৃতির। প্রায়ই সে চার্চের ওপর উঠে পানি মুখে নিয়ে নিচের মানুষজনের উপর ফেলে দেবার ভয় দেখাতো। এলাকায় গ্যাং তৈরি করে ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র জোর করে ছিনিয়ে নিতো। মার্কেট ড্রেটন গ্রামার স্কুল, মার্চেন্ট টেইলরসহ বিভিন্ন স্কুল থেকে তিন-তিনবার সে বহিষ্কার হয়। যদিও সে ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলো না, তবে তার লেখা কিংবা বক্তৃতা দেবার স্টাইল ছিলো অসাধারণ।
ক্লাইভ যখন প্রথম ইন্ডিয়া (মাদ্রাজ) আসে তখন তার বয়স মাত্র ১৮। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে তখন তার পদ ছিলো একজন সাধারণ লেখক হিসেবে। সে যাত্রায় তাদের জাহাজ মেরামতের জন্য ব্রাজিলে নোঙর করে। দীর্ঘ নয় মাস অবস্থানকালে সে এখানে পর্তুগিজ ভাষা শিখে।

সে যখন ভারতে আসে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজের পাটনাম গ্রামের কাছে ফোর্ট সেইন্ট জর্জ নামে এক দুর্গে অবস্থান করছিলো। হঠাৎ একদিন ফোর্ট সেইন্ট দুর্গ আক্রমণ করে ফরাসি সৈন্যবাহিনী। কয়েকদিনের সেই যুদ্ধে বৃটিশবাহিনীর কাছে ফরাসিদের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয় রবার্ট ক্লাইভ। এতে করে কোম্পানিতে তার ভাবমূর্তি বেশ মজবুত হয়। সে সময় মোঘলবাহিনী মাদ্রাজ উদ্ধার করতে এলে বৃটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে ক্লাইভের বীরত্ব লক্ষ্য করেন মেজর লরেন্স।

এর কিছুদিন পরেই লরেন্স ক্লাইভকে কমিশনারের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। সে সময় চতুর ক্লাইভ মারাঠিদের সহযোগিতা নিয়ে মাদ্রাজকে ফরাসি এবং মোঘলদের কাছ থেকে বৃটিশ শাসনের আওতাভুক্ত করে। এই ঘটনার পর ক্লাইভের পরিচিতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পরে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট এল্ডার বলেন, 'ক্লাইভ যার কিনা কোনো মিলিটারি প্রশিক্ষণ নেই; সে ক্যারিশমাটিক মিলিটারি প্রশিক্ষণ নিয়েই পৃথিবীতে এসেছে।'

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাকে তখনকার সময়ে ৭০০ পাউন্ড মূল্যের তলোয়ার প্রদান করে সম্মান জানায়। ক্লাইভ সেই সম্মান ফিরিয়ে দেয়। অভিযোগ ছিলো, লরেন্সকেও একই সম্মান জানাতে হবে। কিন্তু সে তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। দম্ভিত ক্লাইভ ১৭৫৩ সালে দেশে ফিরে যায় এবং বন্ধু নেভিলের ছোটবোন মার্গারেট মেইস্কিলিনকে বিয়ে করে।

১৭৫৫ সালের জুলাই মাসে রবার্ট ক্লাইভ ডেপুটি গভর্নর হিসেবে আবার ফিরে আসে মাদ্রাজে। ফিরতি পথে তার জাহাজ বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনায় ক্লাইভ ৩৩ হাজার পাউন্ড মূল্যের স্বর্ণমুদ্রার বাক্স হারিয়ে ফেলে। যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই রবার্ট ক্লাইভ প্রমোশন পেয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হয়। এর মাঝেই দুটি দুঃসংবাদ ক্লাইভকে চিন্তিত করে তোলে।

১৭৫৬ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সবেমাত্র তার নানা আলিবর্দি খানের উত্তরাধিকারী হিসেবে বাংলার নবাবি শুরু করেছেন। জুন মাসে খবর আসে, নতুন নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে কাশিমবাজার নামক স্থানে আক্রমণ করেছে। ২০ জুন খবর আসে, নবাব কলকাতায়ও ইংরেজদের দুর্গ দখল করে নিয়েছে। বৃটিশদের এই ক্ষতির

পরিমাণ ছিলো দুই কোটি পাউন্ড। বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে যারা বন্দি হয় তাদের শাস্তির জন্য ব্ল্যাকহোল নামের এক অখ্যাত জেলখানায় আটক করা হয়। ইংরেজরা ডিপ্লোম্যাটিক সমাধানের প্রস্তাব দিয়ে চিঠি পাঠায় নবাবের কাছে। ১৭৫৬ সালে ক্রিসমাস চলে এলেও নবাবের কাছ থেকে বৃটিশরা সেই চিঠির কোনো উত্তর না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়। কুলাঙ্গার ক্লাইভকে দায়িত্ব দেয়া হয় দুর্গ উদ্ধারের।

১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারির মধ্যে ক্লাইভ দুটি দুর্গই উদ্ধার করে। প্রায় মাসকাল পরে ৫ ফেব্রুয়ারিতে মাত্র ১৯৪০ জনের ট্রুপ নিয়ে নবাবের বিশাল সৈন্যবাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এর পরের ঘটনা আমরা সবাই জানি। নবাব সেই যুদ্ধে পরাজিত হন। বৃটিশদের ক্ষতিপূরণের দাবিও তিনি মেনে নেন। তারপর নবাব আবার ইংরেজ-ফরাসি যুদ্ধে ফরাসিদের সাহায্য করলেও তারা পরাজিত হয়। পরিশেষে এই নিয়ে আবারও নবাব-ইংরেজ যুদ্ধ লাগে। মীর জাফরকে হাত করে নেয় ক্লাইভ, ওয়াটসন, গভর্নর ড্রেক। পলাশীর আম্রকাননে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়।

১৭৬০ সালে রবার্ট ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে যায়। তার অবর্তমানে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পরে। তাই সে আবার ১৭৬৫ সালে ভারতে ফিরে আসে। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত এখানেই থাকে।

১৭৭৪ সালের ২২ নভেম্বর ইতিহাসের আজন্ম এই খলনায়ক নিজেই নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করে। মানসিক পীড়ন, অতিরিক্ত আফিম সেবনই ছিলো তার আত্মহননের মূল কারণ। ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন শহরে তাকে সমাহিত করা হয়।

পলাশীর যুদ্ধ

বিশ্বাসঘাতকদের শেষ পরিণতি

২৩ জুন ১৭৫৭। সুবা-বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশী নামক প্রান্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্নেল রবার্ট ক্লাইভের সেনাবাহিনী ও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনী একে অন্যের মুখোমুখি অবস্থান নেয়। সকাল নয়টায় যুদ্ধ শুরু হয়ে বিকেল চারটার মধ্যেই শেষ হয়। পরাজয় ঘটে বাংলার নবাবের। বিজয় হয় ইংরেজ এবং বিশ্বাসঘাতকদের। আর সে সঙ্গে নিভে যায় বাংলার স্বাধীনতার প্রদীপ্ত প্রদীপ।

১৭১৯ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তার মৃত্যুর পর ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজউদ্দৌলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন হন। তখন তার বয়স মাত্র ২২ বছর। তরুণ নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিভিন্ন কারণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া রাজসিংহাসনের জন্য লালায়িত ছিলেন সিরাজের পিতামহ আলিবর্দি খাঁর বিশ্বস্ত অনুচর মীর জাফর ও খালা ঘষেটি বেগম। সিংহাসনের লোভে ইংরেজদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ স্থাপন করে পাকাপোক্ত করে নবাবের বিরুদ্ধে নীলনকশা।

বিদ্রোহের আভাস পেয়ে সিরাজ মীর জাফরকে বন্দি করার চিন্তা বাদ দেন। মীর জাফর পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে অঙ্গীকার করেন, তিনি শরীরের একবিন্দু রক্ত থাকতেও বাংলার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন হতে দেবেন না। গৃহবিবাদের মীমাংসা করে তিনি রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, মীর জাফর, মীর মদন, মোহনলাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রেঁকে সৈন্য চালানোর দায়িত্ব দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন।

২৩ জুন সকাল থেকেই পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজরা মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ১৭৫৭ সালের ২২ জুন মধ্যরাতে রবার্ট ক্লাইভ কলকাতা থেকে তার বাহিনী নিয়ে পলাশীর লক্ষ্মীবাগ নামের আমবাগানে এসে তাঁবু গাড়েন। বাগানের উত্তর-পশ্চিম দিকে গঙ্গা নদী। এর উত্তর-পূর্ব দিকে দুই বর্গমাইলব্যাপী আমবাগান। বেলা নয়টায় হঠাৎ করেই মীর মদন ইংরেজবাহিনীকে আক্রমণ করেন। তার প্রবল আক্রমণে টিকতে না পেরে ক্লাইভ তার সেনাবাহিনী নিয়ে আমবাগানে আশ্রয় নেন। ক্লাইভ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। মীর মদন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু মীর জাফর, ইয়ার লতিফ, রায় দুর্লভ যেখানে সৈন্যসমাবেশ করেছিলেন সেখানেই নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। দুপুরের দিকে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে সিরাজউদ্দৌলার গোলা বারুদ ভিজে যায়। তবুও সাহসী মীর মদন ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। কিন্তু আচমকা গোলার আঘাতে মীর মদন শহিদ হন।

গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান নিহত হওয়ার পর সিরাজদ্দৌলা মীর জাফর ও রায় দুর্লভকে তাদের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তীব্রবেগে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন। কিন্তু উভয় সেনাপতি তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন। কোম্পানি ও নবাবের বাহিনীর মধ্যে তখন দূরত্ব মাত্র কয়েকশো গজ। বিকেল পাঁচটায় সিরাজউদ্দৌলার বাহিনী নির্দেশনার অভাবে এবং ইংরেজ বাহিনীর গোলন্দাজি অগ্রসরতার মুখে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করেন। সেদিন তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এ পরাজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়। সে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতার লাল সূর্য পৌনে দুশো বছরের জন্য অস্তমিত হয়।

প্রিয় পাঠক, আপনারা জেনে অবাক হবেন যুদ্ধ পরবর্তীকালে পলাশীর বিশ্বাসঘাতকদের কী ধরনের করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছিলো। প্রায় সবারই মৃত্যু হয়েছিলো মর্মান্তিকভাবে। ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করে না, তাদের করুণ পরিণতি সে কথাই যেনো আবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

মীর জাফর

বিশ্বাসঘাতকদের সর্দার মীর জাফর পবিত্র কুরআন মাথায় রেখে নবাবের সামনে তার পাশে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করার পরপরই বেঈমানি করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কিছু সময়ের জন্য বাংলার মসনদে বসলেও তার জামাতা মীর কাসেম তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। পরবর্তীতে তিনি দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েও ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

জগৎশেঠ, মহারাজা স্বরূপচাঁদ

মীর কাসেম তাদের হত্যা করে। জগৎশেঠকে দূর্গের চূড়া থেকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়।

রায় দুর্লভ

যুদ্ধের পর তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

উর্মিচাঁদ

যুদ্ধের পর রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক প্রতারিত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং উন্মাদ অবস্থায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে তার মৃত্যু ঘটে।

রাজা রাজবল্লভ

পদ্মায় ডুবে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

মীর কাসেম

মীর জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। পরবর্তীতে ইংরেজদের সঙ্গে তার বিরোধ বাঁধে ও বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে ইংরেজদের ভয়ে পালিয়ে বেড়ান এবং অজ্ঞাতনামা অবস্থায় দিল্লিতে তার করুণ মৃত্যু ঘটে।

ইয়ার লতিফ খান

তিনি যুদ্ধের পর হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ধারণা করা হয়, তাকে গোপনে হত্যা করা হয়েছিলো।

মহারাজা নন্দকুমার

তহবিল তছরুপ ও অন্যান্য অভিযোগের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু হয়েছিলো।

মিরন

মীর জাফরের বড় ছেলে মিরন। অসংখ্য কুকর্মের নায়ক এই মিরন। ইংরেজদের নির্দেশে এই মিরনকে হত্যা করে মেজর ওয়ালস। তার

মৃত্যুর ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইংরেজরা বলে বেড়ায়, বজ্রপাতে মিরনের মৃত্যু ঘটেছে।

ঘষেটি বেগম

মিরনের নির্দেশে নৌকা ডুবিয়ে তাকে হত্যা করা হয়।

মুহাম্মদী বেগ

নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকারী। কথিত আছে, মৃত্যুর সময় নবাব তার কাছ থেকে দুই রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু কুখ্যাত মুহাম্মদী বেগ সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে নবাব সিরাজকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদী বেগ উন্মাদ হয়ে কূপে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

দানিশ শাহ্ বা দানা শাহ্

অনেকে বলে, এ ফকির নবাব সিরাজকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। বিখ্যাত নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ তার 'মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা' গ্রন্থে লিখেছেন, বিষাক্ত সাপের কামড়ে দানিশ শাহের মৃত্যু ঘটেছিলো।

রবার্ট ক্লাইভ

পলাশী ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি কোটি টাকার মালিক হন। ইংরেজরা তাকে 'প্লাসি হিরো' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। রবার্ট ক্লাইভ দেশে ফিরে গিয়ে একদিন বিনা কারণে বাথরুমে ঢুকে নিজের গলায় নিজের হাতেই ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেন।

ক্লাফটন

বাংলার বিপুল সম্পদ চুরি করে বিলেতে যাবার সময় জাহাজ ডুবে মারা যান।

তথ্যসূত্র :

১. *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, রজতকান্ত রায়*

২. *পলাশীর যুদ্ধ, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়*

৩. *বিশ্ব ইতিহাস অভিধান, সুভাষ ভট্টাচার্য*

৪. *উইকিপিডিয়া*

১৯৭১-এ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মন্তব্য

'পাকিস্তানিরা স্টুপিড, ইন্ডিয়ানরা প্রতারক'

'ইন্ডিয়ানরা আসলেই বাস্টার্ড। তাদের অধিকাংশই অভদ্র এবং বিশ্বাসঘাতক।'

১৬ জুলাই ১৯৭১, হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক এক আলোচনা শেষে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এ কথাগুলো বলেছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে। এটা সে সময়ের কথা, যখন ইন্ডিয়ার সাহায্য-সহযোগিতায় বাংলাদেশের সর্বত্র শুরু হয়ে গিয়েছিলো প্রবল প্রতিরোধে যুদ্ধ, ইন্ডিয়ায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলো বাংলাদেশের ৭০-৮০ লাখ মানুষ এবং আমেরিকা চোখ বন্ধ করে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞে।

সম্প্রতি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট নিক্সন সময়কালীন কিছু নথিপত্র সর্বসাধারণের জন্য অবমুক্ত করে দিলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং দলিল বের হয়ে আসে। সে সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি অন্ধপ্রেম এবং ভারতের প্রতি বিতৃষ্ণা, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে আলোচনানির্ভর এসব দলিলে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তার সম্পর্ককে বলতেন 'স্পেশাল রিলেশনশিপ' আর তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে ডাকতেন 'ডাইনি বুড়ি' বলে। কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই তিনি এসব শব্দ ব্যবহার করতেন।

২৫ মার্চের গণহত্যার পর থেকেই ভারতে আশ্রয় নিতে থাকে বাংলাদেশি শরণার্থী। একপর্যায়ে তা ৭০-৮০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। ভারতের পক্ষে এ বিশাল শরণার্থীকে ভরণ-পোষণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। ভারত সরকার

বিশ্বনেতাদের বারবার সহযোগিতার হাত বাড়াতে বলেন। বিশেষ করে মার্কিন প্রশাসনের কাছে শরণার্থী পোষণের তহবিল কামনা করেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন জেনারেলকে নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা বরং জুন মাসে একটি পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় জেনারেলকে প্রশ্রয় দিয়ে বলেন, 'ইয়াহিয়া খুবই ভালো বন্ধু। তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি সেটার মর্মযাতনা উপলব্ধি করতে পারছি।'

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, জেনারেলকে তিনি এই গণহত্যার নায়ক মনে না করে পরিস্থিতির শিকার মনে করতেন।

তবে বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যা এবং আমেরিকার পক্ষাবলম্বন বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন আমেরিকার কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড এবং রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং। তারা এই নৃশংস গণহত্যার প্রেক্ষাপটে তার সরকারের মনোভাবের বিরোধিতা করে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগও করেন।

রাষ্ট্রদূতদের এমন আচরণের অবশ্য সহজ ব্যাখ্যা ছিলো রিচার্ড নিক্সনের কাছে। ১৯৭১-এর আগস্টে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের এক মিটিংয়ে তিনি বলেন, 'ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতরা ভারতের প্রেমে পড়ে গেছেন। পাকিস্তানেও আমাদের একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এটা অবশ্য তেমন কিছু নয়, পাকিস্তানিরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। পাকিস্তানিরা সোজাসাপ্টা এবং কখনও কখনও স্টুপিড। আর ইন্ডিয়ানরা হলো প্রতারক কিন্তু ভয়ঙ্কর স্মার্ট। এ কারণেই আমরা তাদের ধোঁকায় পড়ি।'

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি মস্কো, ওয়াশিংটন এবং আরও কয়েকটি পশ্চিমা দেশ সফর করেন এবং পূর্বপাকিস্তানের ব্যাপারে তার করণীয় কী– সে ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। নভেম্বরের ৪ তারিখে নিক্সন-ইন্দিরা বৈঠক হয়। পরদিন সকালে ওভাল অফিসে হেনরি কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বলেন, 'যদিও তিনি ডাইনি বুড়ি, তবুও আমরা যা করতে চেয়েছি সেটাই করতে পেরেছি। ... এবং তাকে বলে দেয়া হয়েছে, যদি তিনি যুদ্ধের

সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন তবে তিনি মোটেও উষ্ণ অভ্যর্থনা পাবেন না।'

নিক্সন শ্লেষাভরে বলেন, 'আমরা ডাইনি বুড়ির মুখে থুতু দিতে পেরেছি।'

দেশে ফেরার পর 'ডাইনি বুড়ি' প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে লিখেন, 'আমি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়েই আশা করি, আপনার পরিষ্কার অবস্থান আমাদের দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করবে। আমাদের সবসময়ের প্রচেষ্টা থাকবে ভুল বোঝাবুঝিগুলো দূর করার এবং কোনো বৈরীতা যেনো আমাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে না পারে।'

তবে মজার ব্যাপার হলো, এই চিঠি পৌছার পরদিন ২১ নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধি বাংলাদেশে দুই লাখ ভারতীয় সৈন্য পাঠান এবং তারা খুব চৌকসভাবে যুদ্ধরত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। তিন সপ্তাহের মধ্যে সত্তর হাজার পাকিস্তানি সেনা সারাদেশে কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং পঁচিশ দিন পর তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধকালীন সময়ে নিক্সন প্রশাসন জেনারেল ইয়াহিয়াকে বাঙালিনিধনের জন্য ৩৮ লাখ ডলারের যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে। এ ছাড়া অন্যান্য সহযোগিতা তো ছিলোই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ক্ষুব্ধ আমেরিকা ভারতের সবধরনের অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত তাদের পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্রবাহী জাহাজ ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে ভারতের উপকূলে সতর্কাবস্থায় রাখা হয়। যদিও তা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। কেননা, এর কিছুদিন পর ইন্দিরা গান্ধি এবং তার প্রশাসন আমেরিকার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কিছুটা হলেও উষ্ণ করতে সক্ষম হন।

সূত্র : এশিয়া টাইমস, ২৩ জুন, ২০০৫
ম্যাসাকার : রবার্ট পাইন

মাদার তেরেসা

মানবসেবার প্রবাদপ্রতিম নাম

মাদার তেরেসা ছিলেন একজন আলবেনিয়ান-বংশোদ্ভূত ভারতীয় ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী। ১৯৫০ সালে কলকাতায় তিনি মিশনারিজ অফ চ্যারিটি নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তিনি দরিদ্র, অসুস্থ, অনাথ ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের সেবা করেছেন। সেই সঙ্গে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিকাশ ও উন্নয়নেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রথমে ভারতে ও পরে সমগ্র বিশ্বে তার এ মিশনারি কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাথমিক জীবন

এই মহিয়সী নারী ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট তৎকালীন উসমানি সাম্রাজ্যের ইউস্কুবে (অধুনা ম্যাসিডোনিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্কোপিয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নিকোলো ও দ্রানা বয়াজু দম্পতির কনিষ্ঠ সন্তান। তারা মূলত আলবেনীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। ১৯১৯ সালে মাত্র আট বছর বয়সে তার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তার মা তাকে রোমান ক্যাথলিক আদর্শে লালন-পালন করেন। ১২ বছর বয়সেই তিনি ধর্মীয় জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে একজন মিশনারি হিসেবে যোগ দেন সিস্টার্স অফ লোরেটো সংস্থায়। মা আর বোনদের সঙ্গে তার আর কোনোদিন দেখা হয়নি।

মানবতার সেবায়

অ্যাগনেস প্রথমে আয়ারল্যান্ডের রথফার্নহ্যামে লোরেটো অ্যাবেতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করতে যান। ১৯২৯ সালে ভারতে এসে দার্জিলিঙে নবদীক্ষিত হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৩১ সালের ২৪ মে তিনি সন্ন্যাসিনী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণ করেন।

স্কুলে পড়াতে তার ভালো লাগলেও কলকাতার দারিদ্র্যে তিনি উত্তরোত্তর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরে শহরে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ আর মৃত্যু; ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাতেও বহু মানুষ মারা যায়। এসব ঘটনা টেরিজার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

১৯৪৮ সালে এই মোতাবেক দরিদ্রের মাঝে মিশনারি কাজ শুরু করেন। প্রথাগত লোরেটো অভ্যাস ত্যাগ করেন। পোশাক হিসেবে পরিধান করেন নীল পাড়ের একটি সাধারণ সাদা সুতির বস্ত্র। এ সময়ই ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বস্তি এলাকায় কাজ শুরু করেন। প্রথমে মতিঝিলে একটি ছোট স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের ডাকে সাড়া দিতে শুরু করেন। তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে থাকেন।

প্রথম দিকের এই দিনগুলো তার জন্য বেশ কষ্টকর ছিলো। এ নিয়ে ডায়েরিতে অনেক কিছুই লিখেছেন। সে সময় তার হাতে কোনো অর্থ ছিলো না। গরিব এবং অনাহারীদের খাবার ও আবাসনের অর্থ জোগাড়ের জন্য তাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হতো। ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হতো। এসব কাজ করতে গিয়ে অনেক সময়ই হতাশা, সন্দেহ ও একাকিত্ব বোধ করেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, কনভেন্টের শান্তির জীবনে ফিরে গেলেই বোধহয় ভালো হবে।

১৯৫২ সালে মাদার তেরেসা কলকাতা নগর কর্তৃপক্ষের দেয়া জমিতে মুমূর্ষুদের জন্য প্রথম আশ্রয় ও সেবাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ভারতীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় একটি পরিত্যক্ত হিন্দু মন্দিরকে কালিঘা হোম ফর দ্য ডাইং-এ রূপান্তরিত করেন। এটি ছিলো দরিদ্র্যদের জন্য নির্মিত দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র। পরবর্তীতে এ কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে রাখেন নির্মল হৃদয়।

এর কিছুদিনের মধ্যেই তেরেসা হ্যানসেন রোগে (সাধারণ্যে কুষ্ঠরোগ নামে পরিচিত) আক্রান্তদের জন্য একটি সেবাকেন্দ্র খোলেন যার নাম দেয়া হয় শান্তিনগর। এছাড়া মিশনারিস অফ চ্যারিটির উদ্যোগে কলকাতার বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশ কিছু কুষ্ঠরোগ চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

অচিরেই মিশনারিস অফ চ্যারিটি দেশ-বিদেশের বহু দাতা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। এর ফলে অনেক অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ১৯৬০-এর দশকের মধ্যে ভারতের সর্বত্র চ্যারিটির অর্থায়ন ও পরিচালনায় প্রচুর দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র, এতিমখানা ও আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বাইরে এর প্রথম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে ভেনেজুয়েলায়। মাত্র ৫ জন সিস্টারকে নিয়ে সে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এরপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৮ সালে রোম, তানজানিয়া এবং অস্ট্রিয়াতে শাখা খোলা হয়। ১৯৭০-এর দশকে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েক ডজন দেশে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবতার সেবায় কাজ করার জন্য ১৯৭৯ সালে তাকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

১৯৮২ সালে বৈরুত অবরোধের চূড়ান্ত প্রতিকূল সময়ে মাদার তেরেসা যুদ্ধের একেবারে ফ্রন্ট লাইনের হাসপাতালে আটকে পড়া ৩৭ শিশুকে উদ্ধার করেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তিনি গেরিলাদের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে পরিবেশ কিছুটা অনুকূলে এনেছিলেন। এ সুযোগেই রেডক্রসের সহায়তায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলে যান। বিধ্বস্ত হাসপাতালগুলো থেকে কম বয়সের রোগীদের সরিয়ে আনেন।

সমাজতান্ত্রিক শাসনের সময়ে পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশেই মিশনারি কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে ইউরোপের সে অংশ তুলনামূলক উদার হয়ে উঠে। এ সময়েই মাদার তেরেসা মিশনারিস অফ চ্যারিটির কাজ পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। এ সময় গর্ভপাত এবং বিবাহবিচ্ছেদ-এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানের কারণে অনেকে তার সমালোচনা করেন।

১৯৯১ সালে মাদার তেরেসা প্রথমবারের মতো মাতৃভূমি তথা আলবেনিয়াতে ফিরে আসেন। এদেশের তিরানা শহরে একটি 'মিশনারিস অফ চ্যারিটি ব্রাদার্স হোম' স্থাপন করেন।

১৯৯৬ সালে পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশে মোট ৫১৭টি মিশন পরিচালনা করছিলেন। মাত্র ১২ জন সদস্য নিয়ে যে চ্যারিটির যাত্রা শুরু হয়েছিলো সময়ের ব্যবধানে তা কয়েক হাজারে পৌঁছায়। তারা সবাই বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪৫০টি কেন্দ্রে মানবসেবার কাজ করে যাচ্ছিলো। বর্তমানে এর অধীনে ৪,০০০ এরও বেশি নান কাজ করছেন। চ্যারিটির অধীনে এতিমখানা ও এইডস আক্রান্তদের পুনর্বাসনকেন্দ্র পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাপী শরণার্থী, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বয়স্ক, মাদকাসক্ত, দরিদ্র, বসতিহীন এবং বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা মহামারিতে আক্রান্ত মানুষের সেবায় চ্যারিটির সবাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

১৯৯৬ সালের এপ্রিলে পড়ে গিয়ে তেরেসা গলার হাড় ভেঙে ফেলেন। আগস্টে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এর পাশাপাশি তার বাম হৃৎপিণ্ডের নিলয় রক্ত পরিবহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের ১৩ই মার্চ মিশনারিস অফ চ্যারিটির প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ান। ৫ সেপ্টেম্বর এ মহিয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন।

মুজিবনগর সরকার
স্বাধীনতাযুদ্ধের নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার হাউজ

২৫ মার্চ কালোরাতের পর লক্ষ্যহীন এবং ভীতসন্ত্রস্ত বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন ছিলো একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। যারা আপৎকালীন মানুষকে আশার বাণীতো শোনাবেনই, সেই সঙ্গে এই যুদ্ধকালীন সময়ে তাদেরকে দেবেন উত্তরণের দিশা। এদিকে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর আক্রমণের পরপরই বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ শুরু হলেও তা পাকবাহিনীর আক্রমণের সামনে টিকতে পারছিলো না। তাদের সংঘবদ্ধ লোকবল ও অস্ত্র-শস্ত্রের যেমন অভাব ছিলো তেমনি দক্ষ নেতৃত্বেরও ছিলো চরম সংকট।

এমন সংকটকালীন মুহূর্তে তাই একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিংবা সরকার গঠনের কোনো বিকল্প ছিলো না, কিন্তু সেটা করা খুব সহজ কাজ ছিলো না। একে তো দেশে যেখানে সেখানে চলছে হানাদারদের গণহত্যা, আবার উল্লেখযোগ্য নেতা যারা বেঁচে আছেন তারাও পালিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিয়েছেন।

এমনই সংকটকালীন সময়ে জাতিকে আশার আলো দেখান আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা তাজউদ্দিন আহমদ। কলকাতায় আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশি নেতাদের নিয়ে একটি প্রবাসী সরকার গঠনের প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এ ব্যাপারে ১৯৭১ সালের ৩রা এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ দিল্লিতে তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সাথে আলোচনায় বসেন। এ আলোচনা শুরুর পূর্বে তাজউদ্দিনকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তখনও তিনি দলের নেতৃস্থানীয় অপর সহকর্মীদের সাক্ষাৎ পাননি। তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্যও তার কাছে এসে পৌঁছেনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনাকালে তিনি যদি কেবলই আওয়ামী লীগের একজন উর্ধ্বতন নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন, তবে সহানুভূতি ও সমবেদনা লাভের সম্ভাবনা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যেতে পারে, এমন আশঙ্কাই তাজউদ্দিন পোষণ করছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন, একটি স্বাধীন সরকার গঠিত না হলে এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে সেই সরকারের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত না হলে ভারত তথা কোনো বিদেশি সরকারের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করা নিরর্থক হবে। এ পরিস্থিতিতে তিনি জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য হিসেবে ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে বৈঠকের সূচনাতেই তাজউদ্দিন জানান, সামরিক বাহিনীর আক্রমণের পরপরই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে সরকার গঠিত হয়েছে। শেখ মুজিবর রহমান সে সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে যোগদানকারী সকল প্রবীণ সহকর্মীই মন্ত্রিসভার সদস্য। শেখ মুজিবের গ্রেফতারের সংবাদ ছাড়া অন্যান্য সহকর্মীদের সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন বলে তাজউদ্দিন দিল্লিতে সমবেত দলীয় প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শক্রমে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে পরিচয় দেন। তাজউদ্দিনের স্থিতধীর বক্তব্যের কারণে ইন্দিরা গান্ধি সে বৈঠকেই বাংলাদেশ সরকারকে মুক্তি সংগ্রামে সম্ভাব্য সকল সহায়তার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। এর ফলশ্রুতিতে ভারত সরকার তার বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয় এবং বাংলাদেশ সরকারকে ভারতীয় এলাকায় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালানোর অনুমতি দান করে।

৮ এপ্রিল, ১৯৭১-এ তাজউদ্দিন কলকাতায় ফিরে ভবানীপুরের রাজেন্দ্র রোডস্থ একটি বাড়িতে উপস্থিত আওয়ামী ও যুব নেতৃবৃন্দকে দিল্লি বৈঠকের ফলাফল অবহিত করেন। কোন বিবেচনায় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও সরকার গঠনকে অনিবর্তনীয় বিষয় হিসেবে উপস্থিত

করেন, তার ব্যাখ্যাও তিনি প্রদান করেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বিতর্ক শুরু করেন তাজউদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে।

শেখ ফজলুল হক মণি মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধিতা করেন। দলীয় অন্ত র্কলহের কারণে অস্থায়ী সরকারের গঠনে বড় কোনো পরিবর্তন বিদেশি সহায়তাকারীদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে এবং মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে– এমন বিবেচনায় তাজউদ্দিন আহ্মদ প্রস্তাবিত সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

১১ এপ্রিল শিলিগুড়ির একটি অনিয়মিত বেতারকেন্দ্র থেকে এবং পরে আকাশবাণীর বিভিন্ন উপকেন্দ্র থেকে তাজউদ্দিন আহ্মদের প্রথম বেতার ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশর সরকার ও সামরিক কমান্ডের ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখার বর্ণনা প্রচারিত হয়।

৯ এপ্রিল তাজউদ্দিন মন্ত্রিসভার অবশিষ্ট সদস্যদের সন্ধানে যান। মালদহ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি, রূপসা ও শিলচর হয়ে তিনি ক্যাপ্টেন মনসুর আলি, আবদুল মান্নান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সঙ্গে করে ১১ এপ্রিল আগরতলা পৌঁছান। খোন্দকার মোশতাক আহ্মদ ও কর্নেল ওসমানী আগরতলায় অপেক্ষা করছিলেন। দু'দিন ধরে বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্ক শেষে তাজউদ্দিন কর্তৃক প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার গঠন ও আয়তন বহাল থাকে, তবে মন্ত্রিসভার ক্ষমতার পরিসরে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়, যা ১৭ এপ্রিলে ঘোষিত 'স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণা'তে প্রতিফলিত হয়।

কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলা গ্রামে, যা পুনঃনামকৃত হয় মুজিবনগর, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বিশ্বের সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে নবগঠিত মন্ত্রিসভার প্রকাশ্য শপথ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। খোন্দকার মোশতাক আহ্মদ আইন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এম. মনসুর আলি অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক মন্ত্রী এবং কর্নেল এম. আতাউল গণি ওসমানী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

সেদিন নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রচারিত 'স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণা'য় শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রের কার্যনির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে এবং তার অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পিত হয় এবং এ আদেশটি ২৬ মার্চ থেকে কার্যকারিতা লাভ করেছে বলে উল্লিখিত হয়। অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পিত হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামের ওপর। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধ পরিচালনা, বিদেশিদের মনোযোগ আকর্ষণ, শরণার্থীদের আশ্রয় ও ভরণ-পোষণসহ যাবতীয় কার্যাদি এই সরকারের অধীনেই পরিচালিত হতো। তাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উত্থানে মুজিবনগর সরকারের অবদান অনস্বীকার্য।

শ্রমিকের দুর্বার জেদ

আট ঘণ্টার বেশি কাজ নয়

মে দিবসের পটভূমি

উনিশ শতকের গোড়ার দিককার কথা। শ্রম ও শ্রমিকের শোষণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর আদিকাল থেকেই সংঘবদ্ধ বা বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চলে আসছে। সংগ্রামের মাধ্যমেই এক সময় পৃথিবী থেকে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হলেও পরে শ্রমিকদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া ছিলো না। ফলে শ্রমিসরা তখনও ছিলো শোষিত। কল-কারখানায় চাকরি টিকিয়ে রাখতে হলে সপ্তাহে ৬ দিন গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো তাদের। কিন্তু তার বিনিময়ে মিলত সামান্য কিছু মজুরি। আর অনিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে রোগ-ব্যাধি, আঘাত আর মৃত্যুই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তাদের জীবনের নির্মম অনুষঙ্গ।

কিন্তু একটা সময় এসে ঘুরে দাঁড়ালো তারা। দৈনিক সর্বোচ্চ আট ঘণ্টা শ্রমের দাবি উত্থাপন করে শ্রমিসরা। ১৮৮০ সালে আমেরিকায় প্রথম এ দাবি উত্থাপিত হয়। ১৮৮৪ সালে শ্রমিসরা প্রতিষ্ঠা করে Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada। পরবর্তীতে অবশ্য ১৮৮৬ সালে সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে Federation of Labor রাখা হয়।

এই সংঘের মাধ্যমেই শ্রমিসরা সংগঠিত হয়ে ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু মালিকরা শ্রমিকদের এই দাবি উপেক্ষা করায় ঢালাই শ্রমিক সিলভিসের নেতৃত্বে ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকায় ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। আর এই ধর্মঘটের প্রধান কেন্দ্র ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহর।

চূড়ান্ত আন্দোলন

১৮৮৪-৮৫ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে অনেক কলকারখানাই বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করে। ফলে চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে

পড়ে বহু শ্রমিক। জীবনে নেমে আসতে থাকে চরম দুঃখ-দুর্দশা। যে কারণে শ্রমিসরা ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

১৮৮৪ সালে American Federation of Labor আট ঘণ্টা দৈনিক শ্রম নির্ধারণের প্রস্তাব পাস করে এবং মালিক ও বণিক শ্রেণীকে এই প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য ১৮৮৬ সালের ১ মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়। তারা এই সময়ের মধ্যে সংঘের আওতাধীন সব শ্রমিক সংগঠনকে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে সংগঠিত করার জন্য বারবার আহ্বান জানায়। প্রথমদিকে অনেকেই একে অবাস্তব অভিলাষ এবং অতি সংস্কারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু বণিক-মালিক শ্রেণীর কোনো ধরনের সাড়া না পেয়ে শ্রমিসরা ধীরে ধীরে প্রতিবাদী ও প্রস্তাব বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে থাকে।

এ সময় 'অ্যালার্ম' নামের একটি পত্রিকায় 'একজন শ্রমিক আট ঘণ্টা কাজ করুক কিংবা ১০ ঘণ্টাই করুক– সে দাস বলেই বিবেচিত'– এ রকম বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি কলাম ছাপা হওয়ার পর জ্বলন্ত আগুনে যেনো ঘি পড়ে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলগুলোও একাত্মতা প্রকাশ করে। ১ মে মাসকে ঘিরে আয়োজিত হতে থাকে বিভিন্ন প্রতিরোধ আর প্রতিবাদ সভা। কিন্তু মালিক-বণিক শ্রেণী অবধারিতভাবে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৮৭৭ সালে শ্রমিসরা একবার রেলপথ অবরোধ করলে পুলিশ ও ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। ঠিক একইভাবে ১ মে দিনটির মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয়ভাবে পুলিশ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা শিকাগো সরকারকে অস্ত্র ও জনবল সংগ্রহে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে। পাশাপাশি ধর্মঘট আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য শিকাগোর বাণিজ্যিক ক্লাব 'ইলিনয়' প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ভারি মেশিনগান কেনার অর্থ প্রদান করে।

এতসব বাধার মুখে অবশেষে ১৮৮৬ সালের ১ মে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন লাখ শ্রমিক তাদের কাজ ফেলে রাস্তায় নেমে আসে। শিকাগোতে আগে থেকেই শ্রমিক ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিলো। প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক কাজ ফেলে শহরের কেন্দ্রস্থলে সমবেত হয়। পার্সন্স, জোয়ান মোস্ট, আগস্ট স্পিজ, লুই লিংসহ অনেকেই শ্রমিকদের মাঝে এই আন্দোলনের পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন। আন্দোলনে বিপুল সাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে শ্রমিকদের সংখ্যা।

পরবর্তীতে ৪ মে আন্দোলন চলাকালে সন্ধ্যায় হালকা বৃষ্টির মধ্যে শিকাগোর 'হে' মার্কেট বাণিজ্যিক এলাকায় শ্রমিসরা মিছিলের উদ্দেশে জড়ো হয়। মিছিল শুরুর আগে শ্রমিক নেতা আগস্ট স্পিজ জড়ো হওয়া শ্রমিকদের উদ্দেশে কিছু কথা বলছিলেন। এ সময় হঠাৎ করেই দূরে দাঁড়ানো পুলিশদলের কাছে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই হামলায় এক পুলিশসহ ছয়জন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়। বোমা বিস্ফোরণের পরপরই পুলিশবাহিনীও শ্রমিকদের ওপর অতর্কিতে হামলা শুরু করে, যা সঙ্গে সঙ্গেই দাঙ্গায় রূপ নেয়।

এই দাঙ্গায় প্রাণ হারান ১১ শ্রমিক। এদিকে পুলিশ হত্যামামলায় শ্রমিকনেতা আগস্ট স্পিজসহ আটজনকে অভিযুক্ত করা হয়। চিরুনী অভিযান চালিয়ে শিকাগো শহর ও এর আশপাশের এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ফিশার, লুইস, জর্জ এঞ্জেল, মাইকেল স্কোয়ার ও নিবেসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক নেতাকে।

এই মামলার প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর উন্মুক্ত স্থানে স্পিজসহ ৬ জনকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। আরেক শ্রমিকনেতা লুই লিং ফাঁসির একদিন আগেই কারাভ্যন্তরে আত্মহত্যা করেন। অভিযুক্ত আরেকজনের ফাঁসি মওকুফ করে পনেরো বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

পরবর্তীতে ১৮৯৩ সালের ২৬ জুন ইলিনয়ের গভর্নর অভিযুক্ত আটজনকেই নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেন এবং দাঙ্গার হুকুম প্রদানকারী পুলিশের কমান্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। তবে অজ্ঞাত সেই বোমা বিস্ফোরণকারীর পরিচয় আর কখনওই প্রকাশ পায়নি। কথিত আছে, আন্দোলন দমন করতে পুলিশের গুপ্তচর ইচ্ছাকৃতভাবে এই বোমা হামলা করে।

অবশেষে শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় সীমার দাবি যুক্তরাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং পয়লা মে বা মে দিবস শ্রমিকদের দাবি আদায়ের দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো, সমগ্র বিশ্বে পহেলা মে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হিসেবে পালিত হলেও আজও তা বিশ্বমানবতার স্বঘোষিত রক্ষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পালন করা হয় না।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

ব্যথাতুর ভাঙন-রদের ইতিহাস

বঙ্গভঙ্গ বাংলার ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরে তৎকালীন বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বড়লাট লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়। বাংলা বিভক্ত করে ফেলার ধারণাটি অবশ্য কার্জন থেকে শুরু হয়নি। ১৭৬৫ সালের পর থেকেই বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ফলে সরকারি প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে বাংলা অতিরিক্ত বড় হয়ে যায় এবং বৃটিশ সরকারের পক্ষে এটির সুষ্ঠু শাসনক্রিয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।
ঙ্গভঙ্গের সূত্রপাত এখান থেকেই। কিন্তু ১৯১১ সালে প্রচণ্ড গণআন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ হয় ১৯৪৭ সালে। এর ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতে যুক্ত হয়। এ পূর্ববঙ্গই পরবর্তীতে পাকিস্তানের কাছ থেকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

বাংলা ও আসাম

বঙ্গপ্রদেশের আয়তন ছিলো ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিলো ৭৮.৫ মিলিয়ন। বঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক এবং অপ্রতুল যাতায়াতব্যবস্থার কারণে পশ্চিমাঞ্চল হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিলো। ১৮৩৬ সালে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে বঙ্গ থেকে পৃথক করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৮৭৪ সালে সিলেটসহ আসামকে বঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন করে চিফ-কমিশনারশিপ গঠন করা হয় এবং ১৮৯৮ সালে লুসাই পাহাড়কে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯০৩ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা হয়। তখন বঙ্গ হতে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয়কে আসাম প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রস্তাবও ছিলো।

নতুন প্রদেশটির নামকরণ করা হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' যার রাজধানী হবে ঢাকা এবং অনুষঙ্গী সদর দফতর হবে চট্টগ্রাম। এর আয়তন হবে ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হবে ৩১ মিলিয়ন যাদের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন মুসলিম ও ১২ মিলিয়ন হিন্দু। এর প্রশাসন একটি আইন পরিষদ ও দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি রাজস্ব বোর্ড নিয়ে গঠিত হবে এবং কলকাতা হাইকোর্টের এখতিয়ার বজায় থাকবে।

১৯০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ থেকে অস্থায়ী ভারত সচিবকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেছেন 'বাঙালিরা নিজেদের এক মহাজাতি মনে করে এবং এক বাঙালি বাবুকে লাট সাহেবের গদিতে বসাতে চায়...। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাদের এই স্বপ্নের সফল রূপায়নে বাধা দেবে। আমরা যদি তাদের আপত্তির কাছে নতি স্বীকার করি তবে ভবিষ্যতে কোনোদিনই বাংলা ভাগ করতে পারবো না...।

লর্ড কার্জন মূল প্রস্তাবটি লন্ডন পাঠান ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ১৯০৫ সালে এবং বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় একই বছরের ১৬ই অক্টোবর।

আন্দোলনের সূত্রপাত

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর হবার আগেই ১৯০৫ সালের ৭ জুলাই তারিখে সুরেন্দ্রনাথ তার 'দি বেঙ্গলি' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে আসন্ন ঘটনাকে বলেছিলেন, 'একটি ভয়ঙ্কর জাতীয় দুর্যোগ' এবং সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সরকার যদি তার সিদ্ধান্ত না পাল্টায় তাহলে সামনে সর্বোচ্চ মাত্রার একটি জাতীয় প্রতিরোধ অপেক্ষমান রয়েছে। বাস্তবেই এ ঘটনা এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের এ ধারণা হয় যে নতুন প্রদেশের ফলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ বেড়ে যাবে।

যদিও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এ বিভক্তি মেনে নিতে পারলো না এবং প্রচুর পরিমাণে জাতীয়তাবাদী লেখা এ সময় প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রস্তাবকদের জন্য এক মর্মস্পর্শী গান 'আমার সোনার বাংলা' লিখেন। এবং অবাক করার মতো বিষয় হলো, এ সাম্প্রদায়িক গানটিই অনেক পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা এবং তা কার্যকর করার পর বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে 'স্বরাজ' শব্দ গৃহীত হয়। স্বরাজ বলতে কংগ্রেসের নরমপন্থীরা বুঝলো ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন, চরমপন্থীরা বুঝলো স্বাধীনতা। এর থেকে উৎপত্তি হলো বিদেশি পণ্য বর্জন প্রসঙ্গ। চরমপন্থীরা চাইলো সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বয়কট।

চরমপন্থীদের ভূমিকা

চরম্পন্থীদের নেতা ছিলেন মূলত বালগঙ্গাধর তিলক এবং অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বিলাত ফেরত। আইসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েও তিনি চাকরিতে যোগ দেননি। অরবিন্দ চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তার চিন্তায় আপোষের কোনো জায়গা ছিলো না। ১৯০৭ সালে সুরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনে লাঠালাঠি, চেয়ার ভাঙাভাঙি, মাথা ফাটানোর ঘটনা ঘটে।

এরপর থেকে অবস্থা আরও অবনতির দিকে যেতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা কিছুতেই বঙ্গভঙ্গের দ্বারা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বঙ্গভূমি কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি। তারা একের পর এক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দিয়ে ইংরেজ সরকারকে এ রায় বাতিল করতে প্ররোচিত করে এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। এতে নিহত হয় হাজার হাজার মানুষ। ক্ষুদিরাম নামে যে কিশোরকে বিপ্লবের প্রতীক মনে করা হয়, সে মূলত এ বঙ্গভঙ্গ রদের জন্যই বোমাবাজি করেছিলো এবং ইংরেজদের কাছে ধৃত হয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে দণ্ডিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ

হিন্দুদের নানামুখী প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে ১৯১১ সালে বঙ্গ আবার একত্রিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক এক নতুন বিভক্তির মাধ্যমে হিন্দি, ওড়িয়া এবং অসমি অঞ্চলগুলো বঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনা হয়। এরই সাথে বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে নয়া দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।

তথ্যসূত্র : *উইকিপিডিয়া*

ইখওয়ানুল মুসলিমিন
ইতিহাস ও ত্যাগের উপাখ্যান

হাসানুল বান্নার নেতৃত্বে ১৯২৮ সালে মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের যাত্রা শুরু। ইসলামি চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী দলটি খুব জলদি মিসরের মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পরবর্তী প্রতিটি সরকারই নানাভাবে দমন-পীড়ন চালায় দলটির নেতাকর্মীদের ওপর। ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে অবশেষে ২০১২ সালে ক্ষমতায় যেতে সমর্থ হয় ইখওয়ান। ইংরেজিতে সংগঠনটির নাম মুসলিম ব্রাদারহুড।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড)-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

১৯২৮ সালের মার্চ মাস : সুয়েজ খাল তীরবর্তী শহর ইসমাইলিয়ায় হাসানুল বান্নার নেতৃত্বে ইখওয়ানুল মুসলিমিন গঠিত হয়। ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণকারী বান্নার বয়স তখন মাত্র ২২ বছর। সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইখওয়ানের যাত্রা শুরু হয় ইসলামি ভাবধারার সংগঠন হিসেবে। দেশটিতে তখন বৃটিশ প্রভাবিত সরকার ক্ষমতায়। ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

পরবর্তীতে সংগঠনটি মিসরে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর : মিসরের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ফাহমি আন-নুকরাশি ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে বিলুপ্ত করার নির্দেশ জারি করেন। এ নির্দেশের কিছুদিনের মধ্যে একজন ইখওয়ান সমর্থকের হাতে প্রাণ হারান নুকরাশি। সরকারি বাহিনী সংগঠনটির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমন অভিযান চালায়।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর : ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্না সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৪৬ বছর।

১৯৫৪ সাল : আরব জাতীয়তাবাদী নেতা জামাল আব্দুন নাসেরের বিপ্লবের প্রতি ইখওয়ানুল মুসলিমিন সমর্থন জানায়। কিন্তু মতপার্থক্য ও অবিশ্বাসের কারণে দু'পক্ষের মধ্যে অতিদ্রুত ভাঙন সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট নাসের ইখওয়ানের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধরপাকড় অভিযান চালান। জামাল আব্দুন নাসের এক হত্যাপ্রচেষ্টা থেকে বেঁচে যাওয়ার পর আবার ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ করেন।

১৯৫৪ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জামাল আব্দুন নাসেরের শাসনামলে হাজার হাজার ইখওয়ান নেতাকর্মীকে গ্রেফতার, নির্যাতন ও হত্যা করা হয়।

১৯৬৬ সাল : ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে পরিচিত সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসিতে ঝুলায় নাসের সরকার।

১৯৭১ সাল : আনোয়ার সাদাত মিসরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সাদাত সরকারের সঙ্গে ইখওয়ানের তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে। আনোয়ার সাদাত ইখওয়ান নেতাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও দলটিকে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

ফিলিস্তিনি ও আরব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ১৯৭৯ সালে গাদ্দার আনোয়ার সাদাত ইহুদিবাদী ইসরাইলের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ওই চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে চেপে বসা ইসরাইল প্রথম একঘরে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়।

১৯৮১ সালে এক সামরিক কুচকাওয়াজের সময় টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে তরুণ সেনা কর্মকর্তা খালিদ ইস্তাম্বুলি প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে গুলি করে হত্যা করেন। ইস্তাম্বুলি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে মনে করা হয়।

১৯৮৪ সাল : প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে একটি ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু এটিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানান। এ কারণে ইখওয়ানের নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হন।

২০০৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইখওয়ানের প্রার্থীরা মিসরের পার্লামেন্টের এক-পঞ্চমাংশ আসন লাভ করেন। ২০১০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটে ইখওয়ানের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হলেও ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ নেননি।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি : প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরশাসক হোসনি মুবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিন আবার রাজনীতিতে প্রকাশ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং নিজেদের রাজনৈতিক শাখার নাম দেয় ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি।

২০১২ সালের ৩০ জুন : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৫১.৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ইখওয়ান নেতা মোহাম্মাদ মুরসি। এই প্রথম দেশটিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো নেতা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন দেশটির প্রথম ইসলামপন্থী ও বেসামরিক প্রেসিডেন্ট।

২০১৩ সালের জুলাই : সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্ট মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ক্ষমতা গ্রহণ করেন জেনারেল সিসি। সুপ্রিম সাংবিধানিক আদালতের প্রধান বিচারপতি আদলি মানসুরকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়। মোহাম্মাদ মুরসিকে গৃহবন্দি করা হয়। ৪ জুলাই তাকে মিসরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয় এবং বর্তমানে তিনি সেখানে সেনা নজরবন্দিতে রয়েছেন। ৫ জুলাই অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট আদলি ইসলামপন্থীদের নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়ার নির্দেশ দেন।

ইখওয়ানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকেই আন্দোলনে নামে ইখওয়ানের লাখ লাখ নেতাকর্মী। তাদের দমন করতে সেনাবাহিনী রাজপথে গুলি চালায়। এতে ২০১৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাস ধরে চলা আন্দোলনে কয়েক হাজার নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন বলে ইখওয়ান দাবি করে।

তথ্যসূত্র : *ইন্টারনেট*

বৃটিশ সিংহাসন

রাণীর বেশে প্রথম এলিজাবেথ ছিলেন পুরুষ!

চেনাজানা রাজকাহিনিতে হঠাৎ ছন্দপতন! আর তার জের ধরেই প্রশ্নের মুখে ব্রিটেনের প্রাচীন রাজ-ইতিহাস। টিউডর বংশের যে রাণী প্রথম এলিজাবেথকে এতোদিন মহান সম্রাজ্ঞী হিসেবে জেনে এসেছেন ব্রিটেনবাসী, তিনি নাকি আদতে ছিলেন পুরুষ! নিছক নিজেদের গাফলতি ঢাকতে এক সাদামাটা গ্রাম্যবালককে প্রথম এলিজাবেথ সাজিয়ে তার পিতা রাজা অষ্টম হেনরির সামনে হাজির করেছিলেন তার দুই সভাসদ। সে গ্রাম্য বালককেই এতোদিন ধরে প্রথম এলিজাবেথ হিসেবে জেনে এসেছে ব্রিটেন।

যুক্তরাষ্ট্রের লেখক স্টিভ বেরি তার নতুন উপন্যাস নিউইয়র্কের ব্যালান্টাইন বুকস থেকে প্রকাশিত 'দ্য কিংস ডিসেপশন'-এ এমনই দাবি করেছেন। এবং সে দাবির পক্ষে তার দলিল– আদতে পুরুষ হওয়ার কারণেই কখনও বিয়ে করেননি 'প্রথম এলিজাবেথ'।

দালিলিক ভিত্তি সত্য। ইতিহাস বলছে, ১৫৫৮ সালে সিংহাসনে বসার পর প্রথম এলিজাবেথ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিয়ে করবেন না। তিনি তার প্রতিজ্ঞা রেখেছেন। স্পেনের তৎকালীন শাসক তার বড় ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব রেখেছিলেন এলিজাবেথের কাছে। কিন্তু রাণী তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর স্পেনের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

স্টিভের প্রশ্ন, বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করে যে যুদ্ধ অনায়াসেই এড়াতে পারতেন, তাতে কেনো জড়িয়ে পড়লেন রাণী? সে পরিচয় লুকিয়ে আছে দক্ষিণ পশ্চিম ব্রিটেনের গ্লস্টারশায়ার কাউন্টির ছোট্ট গ্রাম কটসওল্ডে। এমনটাই দাবি ওই লেখকের।

স্টিভ লিখেছেন, সালটা ১৫৪৩। বছর দশেকের ছোট্ট এলিজাবেথ তখন কটসওল্ডে। লন্ডনে প্লেগ ছড়িয়েছে। তাই মেয়েকে বাঁচাতে কটসওল্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজা অষ্টম হেনরি। বেশ কিছুদিন পরে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই ঘটলো বিপর্যয়। রাজা আসার আগের দিন রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এলিজাবেথ। প্রথমে জ্বর, তারপর বমি, সঙ্গে খিচুনি। অসুস্থতা ক্রমেই বাড়ছে। পরদিন সকালে মারাই গেলেন এলিজাবেথ। অষ্টম হেনরির কটসওল্ড পৌঁছতে তখন আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি।

প্রমাদ গুণলেন এলিজাবেথের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা লেডি ক্যাট অ্যাশলে এবং টমাস প্যারি। এখন কী হবে! মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পেলে রাজা গর্দান নেবেন। কারণ, এলিজাবেথকে রক্ষা করার ভার যে তাদের ওপরেই ছিলো।

প্রাণ বাঁচাতে তাই ফন্দি আঁটলেন ক্যাট এবং টমাস। রাজার সঙ্গে যে তার মেয়ের দেখা সাক্ষাৎ বিশেষ হতো না, সে খবর জানা ছিলো তাদের। এলিজাবেথ ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। তার মাকে হত্যা করেছিলেন যে বাবা, তার সঙ্গে কথা বলতেও ভয়ে কাঁপতেন ছোট্ট এলিজাবেথ। তাই রাজার চোখে ধুলো দেয়া যাবে মনে করে প্রথমে এলিজাবেথের মতো দেখতে একটা মেয়ে জোগাড় করার চেষ্টা চালালেন ক্যাট ও টমাস। সম্ভবত খানিকটা সময় নেবার জন্য। যাতে রাজা বুঝে ওঠার আগে তারা পালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু কপাল মন্দ। কটসওল্ডে বাসিন্দার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তেমন কোনও মেয়ে পাওয়া গেলো না। তখন যা থাকে কপালে ভেবে গ্রামের নেভিল নামের এক সাদামাটা বালককেই এলিজাবেথ সাজিয়ে হাজির করলেন হেনরির সামনে। এবং আশ্চর্য! এই জুয়াটা কাজে লেগে গেলো। বাবাও বুঝতে পারলেন না এ তার মেয়ে নয়!

ক্যাট আর টমাস বুঝলেন, কেল্লা ফতে! স্বয়ং রাজাকে যখন ঠকানো গিয়েছে, তখন বাকিরা কোন ছার! আর রাজবাড়ির কারও সঙ্গেই এলিজাবেথ বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। ফলে আসল-নকলে কেউ ফারাক করতে পারবে না, এমনটাই মনে হয়েছিলো তাদের। নেভিলের বদলে একটা মেয়ে জোগাড় করার চেষ্টা অবশ্য চালিয়েছিলেন ক্যাট-

টমাস। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ঠিক করলেন, নেভিলকে রাজকীয় আদবকায়দা শিখিয়ে দেয়াটাই নিজেদের পিঠ বাঁচানোর সবচেয়ে ভালো উপায়। স্টিভের দাবি, কৌশলটা কাজে লেগে গিয়েছিলো। শেষ দিন পর্যন্ত বিশেষ কেউ জানতে পারেনি সত্যিটা।

একজন ছাড়া। তিনি এলিজাবেথের চিফ মিনিস্টার উইলিয়াম সেসিল। সেসিল অবশ্য শেষ দিন পর্যন্ত সে রহস্য ফাঁস করেননি। স্টিভের মতে, এর কারণটা ছিলো এই, সত্যিটা ফাঁস হয়ে গেলে ব্রিটেনে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তো। কারণ, টিউডর বংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে তখন সে অর্থে সিংহাসনের আর কেউ দাবিদার ছিলো না। তাই বাধ্য হয়েই মুখ বন্ধ রেখেছিলেন সেসিল।

তারপর টেমস নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। চার শতকেরও বেশি সময়ে পুরনো সে সত্য যে গুটিকয়েক মানুষ জানতেন, মারা গিয়েছেন তারাও। শুধু কটসওল্ডে গুজব আকারে কাহিনিটি ঘোরাফেরা করে। সে গুজবের সূত্র ধরেই উপন্যাস লিখেছেন স্টিভ। যদিও তার দাবি, এ নিছক গল্প নয়। এ হলো রাজ–ইতিহাসের প্রাচীনতম চক্রান্ত। দেড় বছর নানা তথ্য ঘেঁটে যে চক্রান্তের রোমহর্ষক বিবরণ লিখেছেন স্টিভ।

এলিজাবেথ যে আদতে পুরুষ ছিলেন তা বুঝাতে বেশ কিছু পরোক্ষ প্রমাণ তুলে ধরেছেন 'দ্য কিংস ডিসেপশন'-এর লেখক। বলেছেন, কটসওল্ড থেকে লন্ডনে ফেরার পর যখন ফের লেখাপড়া শুরু করেন কিশোরী এলিজাবেথ, তখন তার স্বভাব, আচরণের পরিবর্তন দেখে প্রচণ্ড বিস্মিত হন তার গৃহশিক্ষক। এমনকি, নরম পেলব এলিজাবেথের শারীরিক গড়ন পাল্টে পুরুষালি হতে থাকে। এলিজাবেথের আগের ও পরের ছবির মধ্যে সে ফারাক স্পষ্ট।

কিন্তু এ সবই তো অনুমান। পাথুরে প্রমাণ জোগাড় করতে তাই স্টিভের দাবি, অবিলম্বে খোঁড়া হোক প্রথম এলিজাবেথের কবর। ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা হোক, তা ছেলে না মেয়ের।

তাহলে কি চার শতকেরও পুরনো রাজ-ইতিহাস এখন অগ্নিপরীক্ষার মুখে?

সূত্র : *ইন্টারনেট*

রসহ্যময় মমি

পৃথিবীর আদি থেকেই মানুষ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে আসছে। প্রতি যুগেই মানুষের এমন কিছু সৃষ্টি থাকে, যা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টি করে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে মানবজাতির এমন এক রহস্যময় ও বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো মমি, যা কয়েক হাজার বছর পূর্বের সৃষ্টি হলেও মানুষের গবেষণা ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এখনো।

মমি কী?

উইকিপিডিয়ায় মমির সজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'একটি মৃতদেহ যা জীবের শরীরের নরম কোষসমষ্টিক জলবায়ু (বায়ুর প্রভাব অথবা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি) এবং ইচ্ছাকৃত কারণ (বিশেষ দাফন প্রথা) থেকে রক্ষা করা। অন্যভাবে বলা যায়, মমি হলো একটি মৃতদেহ, যা মানবিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবদেহকে ধ্বংস ও ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে।'
মমির প্রসঙ্গ আসলেই আমাদের মন চলে যায় মিসরের পিরামিডগুলোতে। যেখানে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন মমি সংগৃহিত আছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন মিসরকে মমির উৎপত্তিস্থল বললেও একটি গ্রহণযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতারও এক হাজার বছর পূর্বে উত্তর চিলি এবং দক্ষিণ পেরুর চিলচেরাতে মমির সংস্কৃতি চালু হয়। ওই অঞ্চলের আধিবাসীরা সমুদ্রের মাছ খেয়ে জীবনযাপন করতো। বৃটিশ মিউজিয়ামে তাদের বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে মূলত উত্তর চিলি এবং দক্ষিণ পেরুর চিলচেরাতে শুরু হয় মানবদেহের মমির অস্তিত্ব। পূর্ণতা পায় প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতাতেই।

মিসরীয়দের মাঝে একটি ধারণা আছে যে, মানুষের বিনাশ নেই, মৃত্যুর পর মানুষ অন্য জগতে চলে যায়। তাই এ মানবদেহকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মূলত এক প্রকার কুসংস্কারের কারণেই এই মমিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

যেভাবে শুরু

প্রাচীন মিসরে রাজাদের ডাকা হতো ফেরো বা ফারাও নামে (যাদের আমরা ফেরাউন বলে জানি)। যখন মিসরীয়দের মাঝে এ ধারণাটি বদ্ধমূল হলো যে, মানুষ মৃত্যুর পরও মরে না, বরং অন্য জগতে চলে যায়, তখন তারা মানবদেহ সংরক্ষণের উপায় বের করতে লাগলো, এ ক্ষেত্রে তারা সর্বপ্রথম তাদের রাজা বা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মমি তৈরি করলো।

প্রথম কয়েক বছর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মমি বানানো হতো। নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম না থাকায় অনেক মমি নষ্টও হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে তাদের কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরিতে সক্ষম হয়। ধীরে ধীরে অন্য জগতে যাওয়ার এ ধারণাটি জনসাধারণের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সাধারণ মানুষেরও মমি বানানো শুরু হয়েছিলো। এ ক্ষেত্রে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষের মমির মাঝে পার্থক্য করার জন্য সৃষ্টি করা হলো নতুন নিয়মের। রাজা বা উচ্চমর্যাদার লোকদের মমি যেখানে সমাধিস্থ করা হতো, তার উপর বিভিন্ন রকমের পাথর দিয়ে সৌধ নির্মাণ করা হতো। এই সৌধগুলোই পিরামিড নামে পরিচিত। যা পরবর্তী বিভিন্ন যুগে আকর্ষণীয় ডিজাইয়ের মাধ্যমে একটি সুন্দর স্থাপত্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

আর সাধারণ মানুষের মমিগুলো একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে শায়িত করে বিশেষ পদ্ধতিতে কবর দেওয়া হতো। যেগুলো সাধারণ কবরগুলোর চেয়ে ছিলো একটু লম্বা ও প্রশস্ত।

মমির প্রাথমিক কালকে যিশু খ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বের বলে ধারণা করা হয়। সে হিসেবে এখন তা পাঁচ হাজার বছর ছাড়িয়ে গেছে।

অন্য একটি সূত্রে দাবি করা হয়েছে যে, কোনো বিশ্বাসের কারণে নয়, বরং প্রাচীন মিসরের রাজা বাদশাহদের অমরত্বের চাহিদাই মমি আবিষ্কারের কারণ। অর্থাৎ তখনকার রাজারা চেয়েছিলো, আত্মা শেষ হয়ে

গেলেও তাদের দেহ যেনো আজীবন পৃথিবীতে থাকে। তবে অন্যান্য সূত্রের দাবি অনুসারে এ মতটি নিতান্তই দুর্বল।

মমির প্রক্রিয়া

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তৎকালীন মিসরীয়রা মমি তৈরির একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বের করেন।

একজন মানুষের মৃত্যুর পর কয়েকটি ধাপে মমি বানানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো।

১। মৃতব্যক্তির নাকের মাঝে ছিদ্র করে মাথার ঘিলু ও মগজ বের করা হতো। এ ক্ষেত্রে লোহা জাতিয় জিনিসের সহায়তা নেওয়া হতো।

২। পেটের বাম পাশে কেটে ওই কাটা অংশ দিয়ে নাড়িভুড়ি বের করে আনা হতো।

৩। এরপর শরীরের বিভিন্ন পচনশীল অঙ্গ যেমন ফুসফুস, কিডনি, পাকস্থলি ইত্যাদি বের করা হতো।

এসব অঙ্গ বের করার পর আবার পেট সেলাই করে দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে তারা খুব সতর্কতা অবলম্বন করতো। কারণ পেট সেলাই করতে গিয়ে যদি বাতাস ঢুকে যায়, তাহলে পঁচে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো।

৪। অতঃপর শরীর ও বের করা অঙ্গগুলোতে লবণ মেখে শুকানো হতো। (যেমনটি গরুর চামড়ার ক্ষেত্রে করা হয়)

৫। যখন সব ভালোভাবে শুকিয়ে যেতো, তখন গামলা গাইন গাছের পদার্থ ও বিভিন্ন প্রকার মসলা মেখে রেখে দেওয়া হতো। (বর্তমানে আচার যেভাবে বানানো হয়, মসলার প্রভাবে তাতে পচন সৃষ্টি হয় না।)

৬। চল্লিশ দিন পর লিলেনের কাপড় দ্বারা পুরো শরীর পেচিয়ে ফেলা হতো।

আর এভাবেই একটি পচনশীল মানবদেহকে তারা মমির মাধ্যমে সংরক্ষণ করতো বছরের পর বছর।

পিরামিড মমি

মমির কথা সারা বিশ্বে আলোচিত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো মিসরের পিরামিডে সংরক্ষিত ফেরাউনের মমি। হজরত মুসা আ.-এর

সাথে বেয়াদবির ফলে আল্লাহ্র আজাবে নীলনদে ডুবে মৃত্যুবরণ করে ফেরাউন। যার বিশদ বিবরণ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী ফেরাউনের লাশও মমি করে পিরামিডে রাখা হয়।

আল্লাহ্র অবাধ্যতার শাস্তি বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী তা সংরক্ষিত আছে মিসরের পিরামিডে। এ ছাড়াও আরো অসংখ্য মমি এখনও বৃটিশ মিউজিয়ামসহ বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে, যেগুলো আমাদের প্রাচীন সভ্যতার ধর্মহীনতার কথাই মনে করিয়ে দেয় বারবার।

অতিসম্প্রতি ভেনিজুয়েলার বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজের মরদেহকেও মমি বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু একুশ শতকের এই যুগে ধর্মহীনদের একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মমি বা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে মানবদেহ সংরক্ষণের চিন্তা অমূলক স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়।

শেষকথা

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের পথ নিদর্শনের জন্য প্রতি যুগেই প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবি-রাসুল। তারা মানুষকে দেখিয়েছেন সভ্যতা ও মানবিক উৎকর্ষতার পথযাত্রা। কিন্তু প্রতিটি যুগেই কিছু মানুষ নবি রাসুলের প্রদর্শিত পথ থেকে সরে ভিন্ন পথে চলেছে। ইতিহাস সাক্ষ্যদেয় যে, তাদের প্রতিটি কাজই পরবর্তীকালে বর্বরতা হিসেবে আখ্যা পেয়েছে।

মমির সংস্কৃতিও মূলত এক প্রকার আদর্শবিচ্যুতি। তথাপি মানুষের চেষ্টা, যে কোনো অসাধ্যকে সাধন করতে পারে তা প্রতীয়মান হয় এই মমির মাধ্যমে। বিজ্ঞানের এই যুগ থেকেও পাঁচহাজার বছর পূর্বে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে মানবদেহ সংরক্ষণের পদ্ধতি সত্যিই প্রাচীন মিসরীয়দের উন্নত গবেষণায় প্রমাণ করে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই সময়ে যদিও মমির সংস্কৃতি বিরল, তবুও মিসরীয়দের এই অসাধ্য সাধনের কীর্তি বিশ্বাবাসী স্মরণ রাখবে আরো শতাব্দীর পর শতাব্দী। আর মমির মাধ্যমে সংরক্ষিত ফেরাউনের এই দেহ আল্লাহ্র অবাধ্যতার শাস্তির কথাই মনে করিয়ে দিবে প্রতি যুগের নব্য-ফেরাউনদের।

সূত্র : *ইন্টারনেট*

অনেক উচ্চতায় ড. ফজলুর রহমান খান

বিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী ড. এফ আর খান। পুরো নাম ফজলুর রহমান খান। বাংলাদেশের বিশ্ববিখ্যাত এই স্থপতি ও প্রকৌশলী ১৯২৯ সালের ৩ এপ্রিল মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যক্ষ খান বাহাদুর আবদুর রহমান।

শিক্ষাজীবনের শুরুতে ১৯৪৪ সালে ফজলুর রহমান খান আরমানিটোলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, শিবপুর) ভর্তি হন। ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালে পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তিনি ঢাকায় ফিরে এলে তৎকালীন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বাকি পরীক্ষা সমাপ্ত করেন। কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার এবং আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উভয় পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে তাকে বিশেষ বিবেচনায় ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এ মূল্যায়নে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জনের পর আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্তি লাভ করেন ফজলুর রহমান খান। এরপর ১৯৫২ সালে তিনি যুগপৎ সরকারি বৃত্তি ও ফুল ব্রাইট বৃত্তি নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সেখানে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় অ্যাট আরবানা শ্যাম্পেইন থেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তত্ত্বীয় ও ফলিত মেকানিক্স-এ যুগ্ম এমএস করার পর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫৫ সালে তিনি আমেরিকার স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান 'স্কিড মোর'-এর আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে এ কোম্পানির শিকাগো অফিসের পরিচালক হিসেবে যোগদান

করেন। পাশাপাশি তিনি আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি-এর স্থাপত্য বিভাগে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। সেখানে পরে তিনি প্রফেসর এমিরিটাস হয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন ড. এফ আর খান নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, লি হাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইস ফেডারেল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট থেকেও সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৫৬ সালে দেশে ফিরে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পূর্ব পদে যোগদান করেন।

ষাটের দশকে ড. এফ আর খান একের পর এক বড় বড় সব ভবনের নকশা আঁকতে থাকেন। ১৯৬৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ কোম্পানি তাদের সব কর্মীদের জন্য (তখন এই কোম্পানির কর্মচারীর সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৫০ হাজার) একটি মাত্র কার্যালয় বানানোর স্বপ্ন দেখেন। সিয়ার্স অ্যান্ড কোম্পানির সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেন আমাদের ড. এফ আর খান।

পৃথিবীর অন্যতম উচ্চ ভবন (১১০ তলা, এক হাজার ৪৫৪ ফুট উঁচু) শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার ভবনের নকশা তৈরি করেন তিনি। ১০১ একর জমির ওপর তিন বছর এক মাস ১০ দিনে সেই ভবনটি সিয়ার্স টাওয়ার (১৬ জুন, ২০০৯ থেকে পরিবর্তিত নাম উইলিস টাওয়ার) দাঁড়িয়ে যায় সম্পূর্ণ মাথা উঁচু করে। মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এক বাঙালি ব্যক্তিত্বও। এই ভবনই ড. এফ আর খানকে এনে দেয় বিশ্বখ্যাতি। এফ আর খানের জীবদ্দশায় (১৯৭৩ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত) তাঁর নকশা করা সিয়ার্স টাওয়ারই ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন এবং এখনও আমেরিকার সর্বোচ্চ ভবন সেটিই।

তার অন্যান্য অবদানের মধ্যে রয়েছে শিকাগোর জন হ্যানকক সেন্টার, সিয়ার্স টাওয়ার-এর নকশা প্রণয়ন, জন হ্যানকক সেন্টার এর নকশা (১০০ তলা), জেদ্দা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, হজ্জ টার্মিনালের ছাদ কাঠামো (৫০,০০০ বর্গফুট) ও মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করেন।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন তিনি। ১৯৭১ সালে যখন দেশ 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এ লিপ্ত, প্রবাসের বাঙালিদের নিয়ে তিনি একটা ফান্ড গঠন করেছিলেন। এফ আর খানই প্রথম বাঙালি, যিনি মার্কিন সিনেটে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমনে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য। স্বাধীনতা

যুদ্ধে তার গৌরবোজ্জ্বল অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালে তাকে স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

১৯৭২ সালে এফ আর খান 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ রেকর্ড'-এ ম্যান অব দি ইয়ার বিবেচিত হন এবং পাঁচবার স্থাপত্য শিল্পে সবচেয়ে বেশি অবদানকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত হবার গৌরব লাভ করেন (৬৫, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৯ সালে)। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে আমেরিকার 'নিউজউইক' ম্যাগাজিন শিল্প ও স্থাপত্যের উপর প্রচ্ছদকাহিনিতে তাকে মার্কিন স্থাপত্যের শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করে। স্থপতি ড. এফ আর খান আন্তর্জাতিক গগনচুম্বী ও নগরায়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন।

এফ আর খান মুসলিম স্থাপত্য বিষয়ের উপর নানা ধরনের গবেষণা করেছেন। ড. খান Tube in Tube নামে স্থাপত্যশিল্পের এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, যার মাধ্যমে অতি উচ্চ (কমপক্ষে একশত তলা) ভবন স্বল্প খরচে নির্মাণ সম্ভব। গগনচুম্বী ভবনের উপর সাত খন্ডে প্রকাশিত একটি পুস্তক তিনি সম্পাদনা করেন।

১৯৮২ সনের ২৬ মার্চ জেদ্দায় মৃত্যুবরণ করেন এফ আর খান। মৃত্যুর পর তার দেহ আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং শিকাগোতে তাকে সমাহিত করা হয়। ১৯৯৮ সালে শিকাগো শহরের সিয়ার্স টাওয়ারের পাদদেশে অবস্থিত জ্যাকসন সড়কের পশ্চিম পার্শ্ব এবং ফ্রাঙ্কলিন সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বের সংযোগস্থলটিকে নামকরণ করা হয় 'ফজলুর আর. খান ওয়ে'।

১৯৯৯ সালে ফজলুর রহমান খানের স্মরণে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ৪ টাকা মূল্যমানের এই টিকিটটিতে রয়েছে ফজলুর রহমান খানের আবক্ষ চিত্র, আর পটভূমিতে রয়েছে সিয়ার্স টাওয়ারের ছবি।

ইতিহাস পাল্টে দেয়া পাঁচটি রমজান

১. বদরযুদ্ধ

ইসলাম এবং মুসলমানদের ইতিহাসে বদর যুদ্ধের প্রভাব কতটুকু, তা আমরা সবাই জানি। রাসুল সা. ও তাঁর গুটিকয়েক জানবাজ সাহাবি রমজান মাসের প্রখর রোদ উপেক্ষা করে জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাদের এই অনমনীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসের এই নজির পেশ করবার কারণে আল্লাহ পাক ফেরেশতা নাজিল করে তাদের সাহায্য করেছিলেন। ৩১৩ জনের সেই মহিমান্বিত সেনাবাহিনী সুসজ্জিত সহস্রাধিক মুশরিক সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে নবজাত সেই ইসলামি আন্দোলনকে রক্ষা করেছিলেন। দিনটি ছিলো ২ হিজরির ১৭ রমজান (১৩ মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ)।

২. মক্কাবিজয়

রাসুল সা.-এর নবুওয়াতি জীবনের পূর্ণতা আসলো যেন নিজের জন্মভূমি মক্কা রক্তপাতহীন এক অভিযানে জয় করে নেবার মাধ্যমে। সারাটা জীবন যে লোকেরা তাঁকে ও তাঁর সম্মানিত সাহাবিদের ওপর নির্মম অত্যাচার ষড়যন্ত্র চালিয়েছিলো, তাদের একবাক্যে ক্ষমা করে দিয়ে ইসলামের শ্বাশত সৌন্দর্যকে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখলেন তিনি। কাবা শরিফের ভেতর থেকে সকল মূর্তি উচ্ছেদ করলেন, তুলে দিলেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদের সকল বাধা।

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমেই ইসলামের দাওয়াত এবং জিহাদ বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত হতে লাগে। আন্তর্জাতিক ইসলামের গোড়াপত্তন হয় মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। নবম হিজরির রমজান মাসের (১১ জানুয়ারি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) এক পবিত্র দিনে এই বিজয় অর্জিত হয়।

৩. গোয়াডিলথের যুদ্ধ ও স্পেন বিজয়

৯২ হিজরির (১৯ জুলাই ৭১১ খ্রিস্টাব্দ) রমজান মাসের এক পবিত্র দিনে মরক্কোর উপকূল থেকে জাহাজে সাগর পার হয়ে ইউরোপের মাটিতে পা রাখেন বীরকেশরী তারিক বিন জিয়াদ। বিস্ময়ের বিষয় হলো, মরক্কোর এই মানুষটি জন্ম নেন দাস হিসেবে। আর মৃত্যবরণ করেন নিঃস্ব অবস্থায়। সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস পাল্টে দিয়েছিলেন দুঃসাহসী নেতৃত্ব দিয়ে।

জাবালুত্তারিক (জিব্রালটার প্রণালি) এর পাড়ে তারিক বিন জিয়াদ নেমেই তার জাহাজগুলো পুড়িয়ে দেন। সামনে থাকলো দুর্ধর্ষ ভিসিগথ রাজা রডারিকের বিশাল সেনাবাহিনী, আর পেছনে ভূমধ্যসাগরের বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা। এক আল্লাহর উপর ভরসা রেখে রোজাদার সেনাবাহিনী নিয়ে তিনগুণ বেশি স্প্যানিশ সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরপর বাকিটা ইতিহাস!

এভাবেই স্থাপিত হয় আন্দালুসিয়ায় খেলাফতের ভিত্তি। যার হাত ধরে জন্ম নেয় আলোকিত মুসলিম স্পেনের ৮০০ বছরের গৌরবময় ইতিহাস এবং ধীরে ধীরে তা রূপ নেয় ইউরোপিয়ান রেনেসাঁতে।

৪. ২য় ক্রুসেড : হাত্তিনের যুদ্ধ ও সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি

মহান শাসক এবং অসম সাহসী যোদ্ধা মিসরীয় সুলতান গাজি সালাহউদ্দিন আইয়ুবি মুসলিম জাহানের এক অতুল্য বীর। ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের ৮৮ বছরের নিষ্পেষণ থেকে প্রায় বিনা রক্তপাতে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেছিলেন তিনি। ক্রুসেডারদের দলপতি রাজা রিচার্ডের সাথে মহানুভব আচরণের প্রবাদতুল্য ইতিহাস আমরা সবাই জানি। শুধু যেটা জানি না সেটা হলো, এই জেরুজালেম বিজয়ের পথের প্রধানতম নিয়ামক হাত্তিনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন পবিত্র রামাদান মাসে।

২৭ রমজান সারারাত ইবাদত বন্দেগিতে কাটিয়ে দেবার পর ভোরে শুরু হয় আক্রমণ এবং মুসলিম সেনাবাহিনী জয়লাভ করে। সুলায়মান আ. নির্মিত মসজিদুল আকসা, যা পুনরুদ্ধার করেছিলেন ফারুকে আজম উমর

রা. তা আবার মুসলমানদের করতলগত হয়। দিনটি ছিলো ৪ জুলাই ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

৫. আইনে জালুতের যুদ্ধ ও তাতারি প্রতিরোধ

মুসলমান সাম্রাজ্যের তখন এক ক্ষয়িষ্ণু দশা। হালাকু খানের মঙ্গল সেনাবাহিনীর প্রবল আক্রমণে একের পর এক রাজ্যের পতন হচ্ছে; তাতারিদের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞে মুসলিম খেলাফতের এক বিশাল অংশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। প্রায় সমগ্র ইসলামি সাম্রাজ্যই পদানত করে ফেলেছিলো এই তাতারি সেনাদল। শুধু একটা এলাকা ছাড়া, মিসর!

মিসরের মামলুক সুলতান কুতুজ সিদ্ধান্ত নেন তাতার প্রতিরোধের। ৬৫৮ হিজরির ২৫ রমজানে (৩ সেপ্টেম্বর ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ) তার সেনাবাহিনী রুখে দাঁড়ায় প্রবল প্রতাপশালী মঙ্গোলবাহিনীর এবং তুমুল সেই যুদ্ধের ফলে প্রথমবারের মতো পরাজয়ের স্বাদ পায় তাতারিরা। পুনঃজাগরণ হয় ইসলামি শক্তির। আইনে জালুতের এই যুদ্ধের পথ ধরেই অবশেষে তাতারিদের তাড়িয়ে দিতে শুরু করলো মুসলিম সেনাবাহিনী।

(মুসলিম ম্যাটারস অবলম্বনে)

পৃথিবীর লজ্জিত ইতিহাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অন্য নামে ইউরোপিয়ান মহাযুদ্ধ। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির একটা দৃশ্যমান ধ্বংসলীলা যেনো এই যুদ্ধ। অঘোষিতভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো ১৯১৪ সালের জুন মাসে। ২৮ জুনে। আর ঘোষিতভাবে এর সূচনা হয় পরের মাসের ঠিক ২৮ তারিখেই। ২৮ জুলাইতে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মূলত দুইটি শক্তি কাজ করে। দুই পক্ষ। এক পক্ষে ছিলো অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মানি এবং বুলগেরিয়া। একে যৌথশক্তি কিংবা কেন্দ্রীয় শক্তি বলা হয়ে থাকে। অপরপক্ষে ছিলো সার্বিয়া, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি ও আমেরিকা। একে বলা হয় মিত্রশক্তি। যুদ্ধটি চার বছর দীর্ঘায়িত হয়। প্রাণহানি ঘটে আড়াই কোটি মানুষের। আহত হয় প্রায় দুই কোটি। শেষে ১৯১৮ সালে সালের ১১ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসিমাপ্তি হলে এর ফল-পুঁজি মিত্রশক্তির ঘরে ওঠে। যদিও রাশিয়া এই ফলভোগে অক্ষম ছিলো।
যাক, আমাদের এখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা তৈরি হয়েছে আশা করছি। এবার কিছুটা সামনে এগুনো যাক। ঈষৎ-বিশদ গভীরের দিকে।
১৯১৪ সালের ২৮ জুন গভীর রাতে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় অস্ট্রিয়ার পথে। হত্যা করা হয় অস্ট্রিয়ার হবু আর্চডিউক ফার্দিনান্দকে। খুনি অস্ট্রিয়ার নাগরিক বটে, তবে মূলত সে ছিলো একজন সার্ব বসনিয়াক। সার্বিয়ার অধিবাসী। পৃথিবীর একটি অন্যতম নির্বুদ্ধিতাই বলতে হবে এই খুনকে। যা অনেক পরে কেবল সার্ভিয়ার পতনই ডেকে এনেছিলো।
এই হত্যাকাণ্ডের পরে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার কাছে একটা প্রতিবেদন চায়। অস্ট্রিয়া কিছু শর্তও জুড়ে দিতে চেষ্টা করে। সার্বিয়া যা মেনে নিতে

অস্বীকৃতি জানায়। আমাদের এই বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত যে, সার্বিয়া তৎকালীন অস্ট্রিয়ারই কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিলো। সেখানে অস্ট্রিয়ার শাসন বলবৎ ছিলো। যার দরুণ সার্বিয়া স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছিলো। এই প্রাক্কালে 'তরুণ বসনিয়া' নামক এক সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। অস্ট্রিয়ার শাসন থেকে মুক্তিদান যাদের লক্ষ্য। ফার্দিনান্দের খুনি এই ফোরামের কর্মী ছিলো বলে ধারণা করা হয়।

তো সেই মুহূর্তে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় জার্মানি। আমরা জানি, জার্মানির জন্ম মাত্র ১৮৭২ সালে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই দেশটি পৃথিবীর মধ্যে এক সুদৃঢ় স্থান দখল করতে সক্ষম হয়। ফলে জার্মানি ভাবে, এই প্রেক্ষাপটে যদি সে অস্ট্রিয়ার পক্ষ নিয়ে হুমকি- ধামকি দেয়, তবে সারা দুনিয়ায় জার্মানির এক অটল অবস্থান সৃষ্টি করা যাবে। বৈ খারাপ কিছু হবে না। তাই জার্মানি সার্বিয়াকে আঙুল প্রদর্শন করে। আর অস্ট্রিয়া যেহেতু রাশিয়াকে নিয়ে মোটামুটি ভীত থাকতো, সেহেতু খুব সহজেই সে জার্মানির সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে।

এদিকে রাশিয়া কিছু ধর্মীয় এবং জাতিগত কারণে সার্বিয়ার পাশে দাঁড়ায়। সেই সাথে তার আত্ম ব্যাপ্তিও কাম্য ছিলো। ব্যাস, এরপরেই হঠাৎ অস্ট্রিয়া ২৮ জুলাই যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। রাশিয়া সৈন্যিবাহিনী প্রস্তুত করে। সাথে সাথেই নেমে আসে জার্মানি। ভীষণ বেঁধে যায় হুলস্থুল। এমতাবস্থায় ব্রিটেন বড়ই বিপাকে পড়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ, নৌপথে ব্রিটেন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে তেল জোগাড় করে বহুদূর এগিয়ে গেছে। সুতরাং জার্মানি যদি ব্যাপক ত্রাস সৃষ্টি করে ফেলতে পারে, তবে ব্রিটেনের অবস্থা করুণ হয়ে যাবে। নিজে বাঁচতে ব্রিটেন মিত্রশক্তিতে যোগ দেয়। পাশে দাঁড়ায় সার্বিয়ার। রাশিয়ার। একই সঙ্গে ফ্রান্সও এসে যোগদান করে। কারণ এক। জার্মানি জায়গা পোক্ত করে ফেললে সমস্যা আছে। মিত্রশক্তির ভার বেড়ে যায়।

ওদিকে অবশ্য কথা অনুযায়ী জার্মানের পাশে আসে অটোমান সাম্রাজ্য। মানুষ মরতে থাকে। এরপরের ভুলটা জার্মানির। অনেক শক্তির সামনে টিকতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়ে। পাগলের মতো না বুঝে, না ভেবে যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি জাহাজ উড়িয়ে দেয়। যা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

মাঠে নিয়ে আসতে বাধ্য করে। এর আগে যদিও রাশিয়া যুদ্ধ ছেড়ে ভেগেছিলো।
ভাবনা আসতে পারে, মিত্রশক্তির মধ্য থেকে রাশিয়া কেন পিছু হটবে? হ্যাঁ, তখনকার রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এতে বাধ্য করেছিলো। ওই অবস্থায়ই একটা রাশান মৃত্যুকে অনিবার্য করে তোলে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের আগমনে যুদ্ধ বেগবান হয়। একপক্ষীয়। জার্মানির ধ্বংস তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল আধিপত্যের সামনে মাত্রই একটা উৎসব। যুক্তরাষ্ট্র সুযোগ ভালোই কাজে লাগায়। বেশির ভাগ ফল তুলে নেয় আপন ঘরে। কেন্দ্রীয় শক্তির ভেতর থেকে জার্মান সাম্রাজ্য এবং অটোমান সাম্রাজ্য বিশাল ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। আর মিত্রশক্তির ভেতরে রাশিয়া শিকার হয় ক্ষয়ক্ষতির।
কোটি কোটি মানুষের মনুষ্য রক্তের প্রবাহ দিয়ে খেলা এক নিষ্ঠুর অধ্যায়ের সমাপ্তি হয় যখন, তখন পৃথিবী অনেক কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়েছে। শান্তির দিন আসে। ১৯১৮, নভেম্বর ১১।

ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপ

চারিদিকে মাতম উঠে গেছে। হৈ হুল্লোর সবখানে। পৃথিবীর দেশে দেশে। গ্রামেগঞ্জে বাজারে মার্কেটে, শুধু এক গল্প। একই কথা, বিশ্বকাপ। চার বছর পরপর আসলে আমরা ফুটবল নিয়ে মাতামাতিটা একটু বেশিই করি। আমাদের ভালো লাগে, আনন্দ পাই।

আমাদের বিষয়, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ। প্রথমেই ফিফার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। ফিফাকে ফরাসিতে ভেঙে বললে বলতে হয়– ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল এসোসিয়েশন। সকলের জানা আছে, ফিফা একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংগঠন। ঠিক ১১০ বছর আগে ভিন্ন ভিন্ন সাতটি দেশের সাতজন প্রতিনিধির হাতে এর জন্ম। ১৯০৪ সালের ২১ মে।

ফিফার সাফল্য অপরিসীম বলতেই হয়। জাতিসংঘের সঙ্গে ফিফার তুলনা করলে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। কারণ, জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা এখন যেখানে ১৯৩, ফিফার সেখানে ২১৬। কিছুদিন আগে ফিফার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন যিনি এবং যাকে আধুনিক ফিফার অন্যতম পুরোধাব্যক্তি হিসেবে অভিতি করা হয় তার নাম স্সেপ ব্লাটার। ইতোমধ্যে তিনি বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছেন কর্মদক্ষতায়। যদিও ফিফার অন্যান্য কিছু কর্মকর্তার ঘুষ আদান-প্রদানের ইস্যুতে তিনি শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

তবে ভুলে গেলে চলবে না, ফিফার সভাপতিত্বের ইতিহাসে সবচাইতে জ্বলজ্বল করছে যার নাম, তিনি হচ্ছেন জুলে রিমে। ফিফার সমস্ত সাফল্যের সঙ্গে এই রিমের শ্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

আচ্ছা ফুটবল খেলার শুরু কবে? সহজেই উত্তর দেওয়া যায় ১৮৭২ সালে। তৃপ্ত হওয়ার মতো উত্তর বটে। ইংল্যান্ড আর স্কটল্যান্ডের মধ্যে

প্রথমে এই খেলার সূচনা ঘটে। ফুটবল তখন প্রসিদ্ধ কিংবা জনপ্রিয়-কোনোটাই নয়। ফুটবলের জনপ্রিয়তার আরম্ভ মূলত ১৯০০ খৃস্ট সালে। অলিম্পিকে প্রদর্শনী খেলা হিসেবে সুযোগ পাওয়ার পরে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯০৪ এবং ১৯০৬ এ টানা তিনবার অলিম্পিক গেমসে ফুটবলকে দেখা গেলো। নিছক প্রদর্শন করা হলো। এর বেশি কিছু না। এরপর ১৯০৮-এ এসে অলিম্পিক এই ফুটবল খেলাকে আনুষ্ঠানিক খেলার মর্যাদা দিলো।

আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য হচ্ছে, ফিফা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সুইজারল্যান্ডে একটি টুর্নামেন্ট ট্রফির আয়োজন করে। কিন্তু সেটি সহজেই ব্যর্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই টুর্নামেন্টের পরে ১৯০৯ সালে স্যার থমাস লিপটন নামের একজন নিজের নামে একটি ট্রফির ব্যবস্থা করেন। এই ট্রফিটি মোটামুটি সাফল্যের মুখ দেখে। অন্যদিকে ১৯১৪ সাল আসলে ফিফা অলিম্পিকের ফুটবলকে অপেশাদার বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এবং এর দায়িত্ব ফিফা নিজেই নেয়। যদিও দায়িত্বটি আপাতমান দৃষ্টিতে ফিফার উদ্দেশ্য'র সাথে যায় না। ফিফার উদ্দেশ্য ছিলো, একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ব টুর্নামেন্টের শুরু করা। ফিফা অলিম্পিকের ফুটবল প্রতিযোগিতার দায়িত্ব নিলে এই খেলাটিতে অদ্ভুত সাফল্য খুঁজে পায়। ফলে, ১৯২০ সালের অলিম্পিকে এক আন্তঃমহাদেশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যাতে মোট চৌদ্দটি দেশ অংশগ্রহণ করেছিলো। বেলজিয়াম এই আসরে স্বর্ণপদক পেয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯২৪ এবং ১৯২৮ সালে উরুগুয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে।

এবার ১৯২৮ সালেই ফিফা নতুন করে ভাবে। নিজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কিছু করা খুবই আবশ্যিক। তারা আলাদাভাবে একটা ট্রফি, অর্থাৎ বিশ্বকাপের আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চিন্তা এগিয়ে যায়। শেষে ১৯২৯ সালে বার্সেলোনা শহরে এক সেমিনারের মাধ্যমে উরুগুয়েকে বিশ্বকাপের স্বাগতিক দেশ থাকার আহ্বান করে। উরুগুয়েকে সঙ্গে নিয়ে ফিফার নতুন পথচলা শুরু হয়। ফিফা তার সহযোগী সকল দেশকে এতে অংশগ্রহণের আবদার করে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, বলিভিয়া বিশ্বকাপের প্রথম আসরে অংশগ্রহণ

করেছিলো। ইউরোপের অন্য দেশগুলো তেমন সাড়া দেয়নি। বিশাল সাগর পাড়ি দিয়ে আসা সে সময় খুব ভয় এবং ব্যায়বহুল ছিলো।

১৯৩০ সালে এই প্রথম বিশ্বকাপ সংঘটিত হয়েছিলো। যার কোনো বাছাইপর্ব ছিলো না। উরুগুয়ে ১৯৩০ সালের প্রথম জয়ী। প্রথম বিশ্বকাপ আর ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপেই কেবল ষোলোর চাইতে কমসংখ্যক দল অংশগ্রহণ করেছিলো। '৭২-এর পর থেকে বত্রিশটি করে দল প্রতি বিশ্বকাপে প্রতিযোগিতা করে আসছে। আর হ্যাঁ, মনে রাখার মতো আরেকটা বিষয় হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২-৪৬ দুইটি বিশ্বকাপ সংঘটিত হতে পারেনি। এছাড়া, ফিফা বিশ্বকাপের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন।

প্রথম বিশ্বকাপ হতে ১৯৭০-এর বিশ্বকাপ পর্যন্ত বিজয়ী দলকে যে ট্রফি দেওয়া হতো তার নাম- জুলে রিমে ট্রফি। ১৯৭০ এ ব্রাজিল তৃতীয়বারের মতো জয় পেলে চিরতরে ট্রফিটি ব্রাজিলকে দিয়ে দেওয়া হয়। এরপরেই বর্তমান ট্রফির আবির্ভাব। এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৯ আসরের মাঝে মোট আটটি দেশ শিরপা জিতেছে। পাঁচবার জিতে সবার উপরে আছে ব্রাজিল, চারবার জিতে দ্বিতীয় স্থানে আছে ইতালি, তিনবার জিতে পরে আছে জার্মানি। জার্মানির পরে পাশাপাশি অবস্থান আর্জেন্টিনা আর উরুগুয়ের। এরা দুইবার করে জিতেছে এবং সবার শেষে আছে স্পেন, ফ্রান্স আর ইংল্যান্ড। যাদের শিরোপা অর্জন হয়েছে একবার করে।

চিনের প্রাচীরের আড়ালে
রক্তাক্ত তিয়েনআমেন স্কয়ার

এই ইতিহাস কিছুটা গভীরের। লোকের সংসারে অতোটা চাওড় না। সুতরাং আলোচনা ঈষৎ কঠিনই হয়ে যেতে পারে। বিষয় হচ্ছে তিয়েনআমেন স্কয়ার। চিনের বেইজিং শহরের একটা চত্বর। আশির দশকের একদম শেষে এখানে বিপুল রক্তপাত ঘটেছিলো। অনেক গণতন্ত্রবাদী ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিলো। সে গল্পই বলবো।

ধরে নেয়া যায়, তেমন কঠিন কোনো ইতিহাস না। অথবা খুব বেশি যে অপ্রসিদ্ধ, তাও না। আমরা চিনকে চিনি। আমরা জানি, চিন কমিউনিস্ট। ক্ষমতার আগাগোড়া পুরোটাই। এজন্য আমরা কখনো চায়ের কাপে ক্রুদ্ধও হই। স্বয়ং কমিউনিজমের মূলতন্ত্র যেখানে দিনরাত হা-পিত্যেশ করে, সেখানে কমিউনিস্ট শোরগোলের কী মূল্য আছে! তিয়েনআমেন স্কয়ারের সমস্যাটা এখানেই। এই বেহুদা কমিউনিস্ট চিনের বিপক্ষেই তিয়েনআমেন স্কয়ারের আন্দোলন। এর জন্যই ছাত্রদের রক্তপাত। অধিকার আদায়ের জন্য। সংস্কারের জন্য।

সকলের জানার কথা নয় হু ইয়াওবেং সম্পর্কে। তিনি ছিলেন একজন নেতা। সংস্কারক, সংস্কারবাদী। অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং গণতন্ত্রায়নের জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। বেশ জোরেশোরেই। তিয়েনআমেনের বিদ্রোহী জন্ম এই নেতার মৃত্যুর পরেই। তার মৃত্যুতে চিনের গণতান্ত্রিক ছাত্রসমাজ কেমন শোকাতুর হয়ে পড়ে। সেই সাথে যোগ হয় ক্ষুব্ধতা। শুধু ছাত্র নয়, দোলে ওঠে সমস্ত চিনের গণতন্ত্রপিয়াসু জনগণ। হু ইয়াওবেং-এর মৃত্যু হয় ১৯৮৯ এর ১৫ এপ্রিল, লোকেরা সেদিনই তিয়েনআমেন স্কয়ারে সমবেত হয়। কারণ তারা জানে, এই নেতার মৃত্যুতে তাদের সংস্কারবাদের শেষ আশাটুকুও মরে গেছে।

স্বভাবতই তারা জ্বলে ওঠে। ২১ এপ্রিলের মধ্যে তিয়েনআমেন স্কয়ারের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ে অন্যান্য শহরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে। জনগণ ব্যাপক শ্লোগান তোলে। সামাজিক নিরাপত্তার পক্ষে, একদম সরাসরি চিন সরকারের কাছে। ২২ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে তবেই জনতা হু ইয়াওবেং-এর শেষকৃত্য করে।

আন্দোলনের গতি সচল থাকবারই কথা। ২৬ তারিখের দিকে চিনা সরকার নিজের নিয়ন্ত্রিত দৈনিক দ্য পিপলস ডেইলিতে বিক্ষোভকারীদের বিপক্ষে সম্পাদকীয় লেখায়। তাদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ব্যাস, ঘটনা এবার আরো কঠিন হয়ে পড়ে। বিক্ষোভের সমাজ ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে আরও। ছাত্ররা এ আন্দোলনকে একান্ত নিজের করে নেয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিক্ষোভ অভাবনীয়ভাবে উথলে উঠতে থাকে। এরপরে মে মাসের ৪ তারিখে চিনের বড় পাঁচটি শহরে ছাত্র বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। যা একেবারে সারা দুনিয়াকে নাড়িয়ে দেয়।

সেই সময় রাশিয়ার ক্ষমতাসীন সোভিয়েত নেতা ছিলেন মিখাইল গর্বাচেভ। তিনি চিন সফরের ইচ্ছা করেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাশিয়া এবং চিনের মধ্যকার শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটানো। তার আসার কথা ১৫ মে, আর ১৩ মে'তেই শুরু গণঅনশন। এই অংশন সর্বত্র বিপুল সাড়া পায়। এর কারণেই গর্বাচেভ তিয়েনআমেন স্কয়ার এবং ফরবিডেন সিটি পরিদর্শন করতে পারেন না। এই না পারা চিন সরকারকে অত্যাধিক লজ্জাজনক ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। ফলে এক অপমান চিনকে টালমাটাল করে ফেলে। অবস্থা চরম ঘোলাটে হয়ে পড়ে।

তবে মজার বিষয় হলো, ১৯ তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান জাও ঝিয়াং, সাথে প্রধানমন্ত্রী লি পেং তিয়েনআমেন স্কয়ারে জনতার কাছে আসেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করেন। জাও ঝিয়াং এভাবে নত হয় যে, সে বলে- আমাদের এখানে আসতে দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু কে জানতো, তার এই এক বাক্যই উত্তাল জনতার বিপরীতে অসামান্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। এ কথাই তাকে রাজনীতির মাঠ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেদিনই অব্যাহতি দিয়ে গৃহবন্দি করা হয় তাকে। একদম মৃত্যু পর্যন্ত। এহেন পরিস্থিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে দেখা দেয়। মার্শাল ল'-এর ভিত্তিতে সেনাবাহিনী তিয়েনআমেন স্কয়ারের দিকে

আগায়। আর বাধাপ্রাপ্ত হয় বারবার। বিভিন্ন ব্যারিকেডের সামনে। আন্দোলন চলেই চলে। সেনাবাহিনীর সামনে। ২৪ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত সেনাদের- বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ চলে।

এদিকে কমিউনিস্ট পার্টি চূড়ান্তে সিদ্ধান্তে পৌছে গেলো। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ এগুলো। জুন মাসের ৩ তারিখ সেনারা সাঁজোয়া যান ব্যবহার করে তিয়েনআমেন নিজেদের করে নেয়। কীভাবে করা হয় এই কাজ, সেই ইতিহাসের সত্য সাক্ষী পৃথিবীতে লেখা হয়নি কোনোদিন। চিন সরকারের জান্তারা কখনোই এই সংবাদ, এই ইতিহাস বাইরের পৃথিবীকে জানতে দেয়নি।

সেনা হামলার ফলে ১০ লাখ বিক্ষোভকারীর এ অকপট আন্দোলন থেমে যেতে বাধ্য হয়। ৪ তারিখ সকল মৃতদেহ সরিয়ে নেয়া হয়। অসংখ্য ছাত্রের লাশ নিয়ে যাওয়া হয়। কেউ জানে না। কতো লাশ! কোথায় কবর!

হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে মৃতের সংখ্য ঠিক কতো, বলা মুশকিল। কারণ চিন সরকার এ হত্যাকাণ্ড আজ পর্যন্ত ধামাচাপা দিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। বর্তমান চিনেও তিয়েনআমেন স্কয়ার সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা নিষেধ। তবুও মৃতের একটা মোটামুটি হিসাব কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। যেমন চিনের রেডক্রস ৫ জুন সকালে জানিয়েছিলো, মৃত- ২,৬০০। এক অফিসার পরে বলেন, সংখ্যাটা হবে ৫,০০০। নেটো'র কথামতো সেটা ৭,০০০। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে, ৫ জুন সকালে চিনা সরকার রেডিওতে বলেছিলো, তিয়েনআমেনে কোনো নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি! পরে অবশ্য সরকারি খাতায় লেখা হয়েছিলো মৃতের সংখ্যা- ২৪১ জন।

হ্যাঁ, এখানেই তিয়েনআমেন স্কয়ারের বিপ্লব থেমে যায়। একটা নৃশংস গণহত্যার কাছে। ছাত্রদের মৃত্যুতে। অনেক পরিমাণে রক্তবিয়োগে। প্রবল ব্যর্থতায়।

হেলেন কিলার

এক অন্ধ ইতিহাস

অন্ধতা এবং বধিরতা আপনাকে কতোখানি অক্ষম করে দিবে, আপনি কি তা কখনো ভেবে দেখেছেন? অন্ধতার সংকীর্ণ অঞ্চল থেকে সাধের দুনিয়া কতোটুকু কষ্টের হয়, চিন্তা করেছেন! অথচ এই কষ্ট আর বেদনাই কাউকে নিষ্কৃতি দিতে পারে, মুক্তির স্বাদ মুখে তুলে দিতে সক্ষম হয়। কেউ বধির হয়ে থাকলে চলে আসতে পারে শব্দের জগতে, দৃষ্টিহীন হলে দেখে নিতে পারে পৃথিবীর রাশি রাশি সুন্দর। ওই ব্যক্তিকে কেবল একজন হেলেন কিলার হতে হবে, ধারণ করতে হবে তার আত্মবিশ্বাস, হৃদয়গত শক্তি।

ভাবনা আসার কথা, হেলেন কিলার কে? উত্তর একটা সহজেই দেয়া যাবে। হেলেন কিলার একজন অন্ধ, বধির লেখিকা। উনিশ শতকের শেষদিকে এই নারীর জন্ম। ১৮৮০ সালের ২৭ জুন আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম আলাবামার টুস্কাম্বিয়া গ্রামে। পিতার নাম আর্থার কিলার, আর মা হচ্ছেন ক্যাথরিন। জন্মের সময় তিনি পূর্ণ সুস্থ। চক্ষুদৃষ্টি, বাক-শ্রবণ ক্ষমতা হেলেন কিলারের অন্য দশজনের মতই। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার লেখন ভিন্ন ছিলো। কথা ছিলো তিনি জীবনের দ্বিতীয় বছরেই এই দুই মনুষ্য শক্তি হারাবেন। হুম, তাকে আক্রান্ত করলো কঠিন জ্বর। এই জ্বরই তার চোখ এবং কানের উপর পর্দা ঢেলে দিলো। সমস্ত পৃথিবী হেলেন কিলারের কাছে একটা অন্ধকার, শব্দহীন জগত বলে মনে হলো।

দেড় বছর বয়সে তিনি মানুষের অন্যতম দুইটি ইন্দ্রিয়শক্তি হারিয়ে কেমন যেন প্রতিভাধর হয়ে উঠতে থাকলেন। হেলেনের বয়স যখন সাত হলো তখন পিতা-মাতা তার জন্য একজন গৃহশিক্ষিকা রেখে দিলেন। যার নাম ছিলো সুলিভান। সুলিভানের নিজস্ব শ্রমে চিন্তায় হেলেন কিলার ১০ বছর

বয়সে কথা বলা, লেখা পড়া অনেকখানি শিখতে পারলেন। উত্থানটা মূলত এখান থেকেই। তার প্রতিভা প্রকাশ পেতে শুরু করলো। নিজেই নিজের মুখ, ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে কথা বলাটা পুরোই আয়ত্ব করে ফেললেন। আশ্চর্য বটে!

১৯০৪ সালে হেলেন কিলার র‍্যাডক্লিফ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করেন। এর আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন হেলেনের বাবা। এখন তার জন্য জীবনটা আরো একটু বেশি কঠিনই হয়ে পড়ে। প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের জানা থাকা দরকার, হেলেন চৌদ্দ বছর বয়সে নিউইয়র্কের একটি স্কুলে ভর্তি হন। যে স্কুলের নামটা হচ্ছে হুমাস টাইসন। সেখানে এক বিখ্যাত কবি মার্ক টোয়েনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের আছর কিছুটা হলেও হেলেনের গায়ে এসে লাগে।

হেলেন কিলারের মিশন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি অন্ধ-বধির লোকদেরকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরতে অসামান্য মেধাশ্রমের পরিচয় দেন। হাজার হাজার মানুষের জমায়েতে তিনি এই প্রতিবন্ধিতার পক্ষে ভাষণ দেন এবং একাডেমিক পড়াশোনার সমাপ্তি হলেই তিনি বহুরকম প্রতিবন্ধী স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। সেই সাথে একটা সমিতির আলোচনাও তোলেন। অন্ধ-বধিরদের সাহায্যদানের জন্য তিনি এই সমিতিকেও বেশ একটা মাধ্যম হিসেবে নিয়েছিলেন, সুফলও পেয়েছিলেন।

দৃষ্টিশক্তি না থাকলেই কি, তিনি সারা জীবনে এতো বেশি অধ্যয়ন করেছিলেন যে, একজন দৃষ্টিমান ব্যক্তির যার কাছাকাছিও যেতে পারে না। তার নিজের লিখিত বইয়ের সংখ্যা মোট ১১ টি। কারো মুখে শোনা যায়, ১৩ টি। বেশিরভাগ বইয়ের পাতায় পাতায় তিনি অন্ধ কিংবা বধির জীবনের ব্যয়িত মূল্যকে ফুটিয়ে তোলেন। এরই মাঝ দিয়ে তিনি পাঠকের মনগভীরে শক্ত রেখাপাত করেন। বই লেখার বাইরে তিনি প্রতিবন্ধী জীবন নিয়ে একখানা চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছিলেন। যেখানে প্রতিবন্ধী চরিত্রে নিজেই অভিনয় করেছিলেন। একজন অন্ধ, বধির ব্যক্তির পক্ষে এর চাইতে বেশি আর কী সম্ভব হতে পারে!

হেলেন কিলান অন্ধতার ভেতরে কী পরিমানে বিচক্ষণ, সেটা এই কথাতেই বোঝা যায় যে, তিনি বাদ্যযন্ত্রে হাত রেখে সুর অনুধাবন করতে

পারতেন। সঙ্গীতের সাথে সাথে নিজেও দুলে ওঠতে পারতেন। সংগীত তার অনেক প্রিয় ছিলো। কখনো কখনো তাকে সুরের মধ্যে বিলীন হয়ে থাকতে দেখা যেতো। হেলেন কবিতা লিখতেন। কবিতা পড়তেন। কবিতা ভালোবাসতেন। সঙ্গীত এবং কবিতার সাথে হেলেনের সম্পর্ক বিশ শতকের অন্যান্য অনেককে নতুন পথ দেখায়।

একটা জিনিস আমাদের খেয়াল হয়, হেলেনের সমস্ত জীবনের অংশে অংশে কেবল মিশে আছে প্রতিবন্ধী জীবনের বেদনা। দুঃখ। এজন্য তার ভালো লাগাটাও একটু অন্যরকম। হেলেন কবিতায় জন মিল্টন আর ভ্যান বিতোভেনের নাম স্মরণ করেছিলেন। তথা, এই দুইজনকেই তার পছন্দ। আমরা জন মিল্টনের জীবনের দিকে তাকালে দেখি, এই লেখক জীবনের মাঝপথে এসে অন্ধ হয়ে যান। ১৯৫২ সালে। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি ব্যাপক সমাদৃত দুইটি বই লেখেন- প্যারাডাইস লস, প্যারাডাইস রিগেইন্ড। পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ ভাষায় বইগুলো অনুবাদ হয়েছে বলে শোনা যায়। অন্যদিকে লুডউইং ভ্যান বিতোভেন একজন সঙ্গীতশিল্পী। মজার বিষয় হলো, ইনি একসময় বধির হতে শুরু করেন। একদা পুরো বধির হয়ে যান। অথচ তার সেরা সেরা গানগুলো এই বধিরতা আসার পরেই সৃষ্টি হয়। তাহলে তো ধরে নিতে অসুবিধা নেই, হেলেনের ভালোলাগাটাও এই প্রতিবন্ধিতার সাথেই মিশে ছিলো। এইজন্যই জন মিল্টন ও বিতোভেনকে তিনি স্বজাতির চেয়েও বেশি কিছু ভেবেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হেলেন কিলারকে বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে গিয়ে রোগীদের আশার বাণী শোনানোর আবদার করেন। হেলেন রাজি হন। অনেক আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি তখন দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে বেড়াতে শরু করেন।

এরপরেও তিনি অনেক কাল বেঁচে ছিলেন। সবশেষে ১৯৬৮ সালের ১ জুন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৮৭ বছর বয়সে। রেখে যান এক আশ্চর্য রহস্যময় জীবন।

ইতিহাসের ঘৃণা ও ভালোবাসা

অ্যাডলফ হিটলার আর নাৎসি বাহিনী

অ্যাডলফ হিটলার। ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল যার জন্ম। জার্মানির ব্রাউনাউ আম-ইন শহরে। বাবা আলোইস আর মায়ের নাম হচ্ছে ক্লারা। বাবা আলোইসের হিটলার নামটি গ্রহণ করা নিয়েও কথা আছে। শোনা যায়, আলোইসের জন্ম এক অবৈধ সূত্র থেকে। তার মা মারিয়া আন্না আর প্রতিবেশী জোয়ান জর্জ হিটলারের সম্মিলিত ফসল সে। সেই সুবাদে বাবার হিটলার নামটি আলোইস ধারণ করেন ১৮৭৬ সালে। এছাড়া একটা মজার বিষয় হলো, আলোইসের বাবা জর্জ হিটলার ছিলেন একজন ইহুদি।

অ্যাডলফ হিটলারের বাবা আলোইস ছিলেন একজন কাস্টম অফিসার। হিটলারের জন্মের পর তিনি কাস্টমের চাকরি থেকে অবসর নেন। চলে যান অস্ট্রিয়ার লিনৎস শহরে। হিটলারের বাল্যকাল কাটে ওই এলাকাতেই।

হিটলারের ভালোবাসা বরাবরের মতো ছিলো মায়ের সাথে। বাবাকে তিনি ভয় করতেন। বাবা মারা যান ১৯০৩ সালে। কেমন একটা শূন্যতা নেমে আসে। বাবার রেখে যাওয়া পেনশন আর সঞ্চয় দিয়ে চলে সংসার। আর চার বছর পর মারা যান মা ক্লারাও। মায়ের মৃত্যুতে হিটলার নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

এরপরই হিটলারের মাথায় চিন্তা খেলে যায় ভিন্নরকম। চিত্রশিল্পী হওয়ার ইচ্ছা জাগে। ব্যাস, রওয়ানা দেন ভিয়েনায়। না, সেখানে বিশেষ সুবিধা করা যায় না। ফিরে আসেন, আবার যান। অল্প একটু ভাতায় ভিয়েনায় চলা দুষ্কর হয়ে পড়ে। কিন্তু ভাবনা হয়, শিল্পী হিসেবে হয়তো তার

সম্ভাবনা রয়ে গেছে। এ চিন্তা থেকে পরীক্ষা দেন ভিয়েনার একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে, হয় না। সৈনিক কী করে চিত্রশিল্পী হয়!

এখন মূলত সামনে চলা শুরু হয়। হিটলার ছেড়ে আসেন ভিয়েনা। মিউনিখে। দুটো বছর দারুণ কষ্টে কাটে। এরপরই যোগ দেন স্বেচ্ছাসেবক পার্টিতে। আরও পরে যান লেবার পার্টিতে। কয়েক বছরের মাথায় পার্টির প্রধান নির্বাচিত হন। নাম পাল্টে ফেলেন পার্টির। নতুন নাম হয়- ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি। পরবর্তীতে যাকে নাৎসি বাহিনী বলে সবাই জানে।

একটু বিস্তারিতভাবে বললে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুরোটা সময় হিটলার যুদ্ধে সক্রিয় থাকেন। মাঝখানে একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেও যান। মিউনিখে এসে প্রথমেই হিটলার লেবার পার্টিতে যোগ দেননি। ভর্তি হতে চেয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে। কিন্তু ভর্তিতে হিটলার আনফিট সাব্যস্ত হন। এই জেদটা থেকে যায়। পরে যুদ্ধের মাঠে হিটলারকে এই বোধই জাগিয়ে তোলে। হিটলার তো এমনিতেই একরোখা আর জেদি। উপরি যুক্ত হয় এই ভাবনা। ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় আয়রন ক্রস লাভ করেছিলেন, যুদ্ধের পরে তাকে দেওয়া হয় প্রথম সম্মানসূচক পদক আয়রন ক্রস।

১৯৯৯ সালে আসেন রাজনীতির মাঠে। ওই যে লেবার পার্টি। ওটাতে সামরিক রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯২০ সালে তাকে দলটির প্রচারণার দায়িত্ব দেয়া হয়। এর কিছুদিন পরেই নামটা পরিবর্তন করেন।

এ সময় একটা রাজনৈতিক দলের সম্ভাবনা ছিলো অনেক। এজন্য হিটলার একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিলেন। ওয়ার্কার্স পার্টিকে নিয়ে। কিন্তু তার চিন্তা ভুণ্ডল হয়। বিনিময়ে আশ্রয় হয় কারাগারের বন্ধ কুঠুরিতে। যদিও আমরা সকলেই জেনেছিলাম, হিটলার কারাগারে বেশ মৌজেই ছিলেন।

হিটলারকে কারাগারে থাকতে হয়েছিলো সাড়ে চার বছর। পুরোটা সময় তাকে দেয়া হয়েছিলো বিশেষ বন্দির মর্যাদা। সারাটা সময় একটা বইয়ের ডিরেকশন দিতেন। আর ডিরেকশন নিচ্ছিলেন তার ছায়াসঙ্গী রুডলফ হেস। বড় প্রিয় ছিলেন তিনি হিটলারের। বইটি পৃথিবীর অন্যতম একটি রাজনীতি দর্শনের বই। এখানে হিটলারের অতীতের চার বছরের জীবন

আর তার দলের ভবিষ্যত কর্মকাণ্ডের বিস্তার দিতে ঠাসা। ১৯২৫ সালে এটির প্রথম প্রকাশ হয়। যাকগে, বই প্রকাশিত হওয়ার বছরেই হিটলার বেরিয়ে আসেন জেলখানা থেকে। আর সঙ্গে থাকে তার কারাগারে বসে লেখা বইটি। মেইন ক্যাম্ফ বা আমার সংগ্রাম।

হিটলারের জন্য দু'বছর নিষিদ্ধ ছিলো সভা-সমাবেশ আর বক্তৃতা। ১৯২৭ সালের পর থেকে হিটলার শুরু করেন বক্তৃতা। আর এটাই তাকে নিয়ে যায় সর্বশেষ শিখরে। চূড়ান্ত জায়গায়। মানুষ তাকে ভালোবাসতে থাকে। নার্থসি এগিয়ে যায়। হিটলারের বক্তৃতার মূলকথাই ছিলো জার্মান জাতীয়তাবাদ আর ইহুদি বিতাড়ন।

দলে দলে মানুষ আসতে থাকে। ১৯৩২ সালে নির্বাচন করেন রাষ্ট্রপতি পদে। হিন্ডেনবার্গের বিপরীতে হেরে যান। এর এক বছর পর হিন্ডেনবার্গেই তাকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়ে দেন।

হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর, যেনো বা ডিক্টেটর। অন্য সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেন। আরও অনেক নিয়মই জোরের বলে করে ফেলেন। দিন গড়ায়। আস্তে আস্তে হিটলার করায়ত্ত করার স্বপ্ন দেখেন সাড়া বিশ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটান।

পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয় যুদ্ধ। এখানেও জার্মানদের আরেকটা পতন। এবার হিটলারের হাত ধরে। ব্যাপকভাবে ইহুদি নিধন চলে, হিটলার মেরে মেরে পৃথিবীর কিছু কি উপকার করেন? কে জানে!

হিটলারের শেষটা মজার। হিটলার পোল্যান্ড দখল করার পর ফ্রান্স-বৃটেন তার বিরুদ্ধে যায়। হিটলার আফ্রিকা আর ইউরোপের কিছু দেশ দখল করে নেন। কিন্তু পরাজয় লেখা ছিলো তার ভাগ্যে। জয় ছিলো মিত্রশক্তির। যুদ্ধ ওভাবেই হাঁটে। ১৯৪৫ পর্যন্ত।

হিটলার শেষ কয়টা দিন বার্লিনেই ছিলেন। মৃত্যুর আগে বিয়ে করেন ইভা ব্রাউনকে। সৈন্যদের বলে যান তাকে পুড়িয়ে ফেলতে। তাকে মারার জন্য ধাওয়া করা হচ্ছিলো। না, নিজেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। জার্মান পরাজয়ের সাথে সাথে পরাজয় ঘটে জার্মানির, অ্যাডলফ হিটলারের। পৃথিবীর কুখ্যাত মানব।

পৃথিবীর অভিশাপ

কেন অভিশপ্ত বিতাড়িত ইহুদিরা

এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় ইহুদি, বিপরীতে হিটলার। ইহুদি একটা জাতি এবং বিশ্বাসমতো সকলেই বলতে বাধ্য হবেন যে, ইহুদিরাই সারা দুনিয়ার সবচাইতে ঘৃণিত জাতি। আমাদের শত্রু। মানবতার শত্রু। মার খাওয়া আর ক্ষণে ক্ষণে বিতাড়িত হওয়া এক অশুদ্ধ সম্প্রদায়। সোজা বাংলায় ঘাড়বাঁকা, দুর্দান্ত চক্রান্ত-পরায়ণ। প্রতিশোধের অমানবিক রক্ত নিয়ে ঘুরে ফেরা এক অসভ্য জনগোষ্ঠী।

ওই যে ইয়াকুব আ.-এর এক স্ত্রী থেকে যে দশ পুত্র; আমাদের জানা আছে তাদের কাহিনি। ছোট্ট ইউসুফের প্রতি তাদের আচরণ সম্পর্কে আমরা বেশ ভালোই জেনেছি। শুনেছি তাদের ষড়যন্ত্র আর কূটিলতার কথা। আসলে এই লেখায় ওই দশ ভাইয়ের দিকে ইহুদি পত্তনের ইশারা করা হচ্ছে না। ভুল না বোঝাই উত্তম। কেবল একটু আঁচড় কাটার ইচ্ছা হচ্ছে। এই ইহুদি, আদিমকাল থেকেই সে কেমন, কেমন তার স্বভাব; আমরা খুব সাধারণ চোখেও যদি তাকাই তাহলে ইহুদিদের যাযাবরবৃত্তি আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়, ইহুদি জাতি কোন পর্যায়িক অসভ্য।

হালে, এই যে আমাদের মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের দ্বন্দ্ব, এটা কিন্তু এক সময় খৃস্টবাদের সঙ্গেই ছিলো। যদি হিসাব করা হয়, কতোবার এই ইহুদিরা খৃস্টানশাসিত ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তবে পরিষ্কার একটা সংখ্যা বেরিয়ে আসে- ৪৭ বার। সাতচল্লিশবারের বিতাড়িত জাতি কিভাবে মানুষিক হয়ে থাকে, এই প্রশ্ন অনেক আগেই বিগত। নতুন করে বলার কিছুই নেই।

বিতাড়নের পর বিতাড়ন, বারবার নির্বাসন- এসব বিষয় আসলেই ইহুদিদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছে। তাদেরকে একটা জটিলতম সমস্যার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করে অনেক চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।

আমরা বরাবরের মতোই অবগত যে, ইহুদি জাতি অত্যন্ত পরিশ্রমী। আপনার মালিকানায় কিছু জমি আছে। আপনি চিন্তা করতে পারেন, জমিটা কোনো কৃষকের হাতে দিয়ে আমি ঘরে বসে লাভবান হই। কিন্তু একজন ইহুদি কখনোই এমন করে ভাববে না। সে তার পরিশ্রম কাজে লাগাবে। সে তার সম্ভাবনার বিন্দুমাত্রও অন্যকে দিবে না। এটা যেমনভাবে ইহুদিদের অগ্রসরমানতার হাতিয়ার, ঠিক তেমনই আমাদের জন্য শংকার কারণ। আমরা এই আলোচনায় পরে আসছি।

হিটলার ইহুদিদের মেরে বড় মাপের ভালো কাজ করেছেন। এই কথার পর অনেকেই ভেবে নিবেন, লেখাটার মাধ্যমে আবার একজন হিটলারের জন্য আকুতি করা হচ্ছে। তাহলে কিন্তু বিরাট ভুল। ব্যাক্তিগতভাবেও এ বিশ্বাস আছে, হিটলারের কারণেই ইহুদিরা এইভাবে মিডলিস্টে এ্যাটাক করেছে। কেননা, হিটলার ছাড়া কোনোভাবেই জায়নিজম বিশ্বের কাছে এতোটা বাজারমূল্য পেতো না। এর বাইরেও আমাদের অনেক যুক্তি আছে। সেদিকে না হাঁটাই সমীচীন। লম্বা-চওড়া আলোচনা।

হিটলার মেরেছে, ভালোই করেছে। লেখাটা এই রেখাতে এনেই শেষ করে দেয়ার ইচ্ছা। হিটলারের কী যুক্তি ছিলো? এই প্রশ্নের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো হিটলারের অবস্থান। তথা হিটলারের ধারণা এবং বিচারই এখানে অধিক চিন্তনীয়। হিটলারের দেশপ্রেম এবং জন্মগত নির্ভারতাও একটা প্রশ্ন। এসবের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে সহজভাবেই আমাদের আজকের মতো ইহুদি-বিচার শেষ হবে। যেহেতু আমরা হিটলারের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইহুদিকে দেখার চেষ্টা করছি।

একটা সত্য কথা হলো, ইহুদিবিদ্বেষ শুধুমাত্রই হিটলারের রক্তের ভেতরগত কিছু না। উনিশ শতকের আগ মুহূর্তে এই বিদ্বেষ ঢুকে পড়ে ইউরোপের প্রত্যেক ক্রিশ্চিয়ানের রক্তে। ইউরোপে যখন মোচড়ে উঠলো জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে ইহুদিরা খৃস্টানদের অলসতার বরাতে ব্যবসায় অনেক এগিয়ে- সেই মুহূর্তে এসে প্রতিটা ইউরোপিয়ান যে ইহুদিদের ঘৃণা করবে, এটা বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

এবার ভাববার বিষয়, হিটলার এমনিতেই যেহেতু অন্য সব নাগরিক থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, শক্তিমান আর সাহসী- সেহেতু ইহুদিবিদ্বেষ তার ভেতরে অন্য সবার চাইতে অনেক বেশিই ক্ষিপ্র হওয়ার কথা। সেই সুবাদে হিটলারের কাছে ইহুদিদের মার খাওয়ার প্রথম কারণ এটাই। অর্থাৎ

হিটলারের ইহুদিবিদ্বেষ। পাঠকের খেয়াল রাখা উচিত, এখানে অত্যন্ত চিন্তার সাথে এন্টি-সেমিটিসম পরিভাষাটি বয়কট করা হয়েছে।

ইহুদিরা ইউরোপে ঢুকেছে বহুত বছর আগে। দিনে দিনে তারা হাত দিয়েছে কল-কারখানায়। দখলে ঝুঁকেছে। এক সময় সেই দখল পোক্ত হয়েছে। তখন মার্ক্সবাদ কথা বলেছে ইহুদির পক্ষে। ট্রেড ইউনিয়নের বরাত দিয়ে। মার্ক্স তো ইহুদি। তার বুদ্ধিতেই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হতে দেখা গেছে জার্মানির অসংখ্য ইন্ড্রাস্টি।

এখন চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, ইহুদিদের হাত থেকে দখলদারিত্ব চলে যাওয়ার পরেই তারা মনোযোগ করেছে চিন্তায়। তারা সফল হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, হিটলারের দেশপ্রেমের খবর। সুতরাং এই সংকটের সময় কোনোভাবেই তার বসে থাকা সম্ভব না। ইহুদিরাই তার জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর চিহ্ন। সে এই চিহ্নটা মুছে দেয়ার চেষ্টা করেছে। মেরেছে ৬০ লাখ ইহুদি। আমরা যাকে হলোকস্ট বলে জানি।

আমাদের আলোচনার অল্প একটুই বাকি আছে। সেটা একান্তই আমাদের জন্য। হিটলারের হলোকস্টে মৃতের সংখ্যা ৬০ লাখ। যা ওই সময়ের ইহুদির ৩৭ শতাংশ। যতোই মারা হোক, সব তো আর নিঃশেষ করা যায়নি। আমরা কি তাহলে ভেবে নেবো হিটলার সব মেরে ফেলতে সক্ষম ছিলো না? এই ব্যাপারে হিটলারের একটা প্রসিদ্ধ উক্তি আছে– 'কিছু ইহুদি বাঁচিয়ে রেখেছি পরবর্তীদের চিন্তার জন্য।'

না, এর বাইরেও আরেকটা কথা কিন্তু আছে। ৩৭ শতাংশই মাত্র মেরেছে সে। তাহলে কিছু ইহুদি মানে কী? আসলে হিটলার একটা চূড়ান্ত বিতাড়ন চেয়েছিলো। মুসলমানদের শত্রু সবাই। ইহুদি যেমেন, তেমনই খৃস্টান। খৃস্টানরা কোনোভাবে ইহুদিদেরকে আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকিয়ে দিলো। তথা মিডলইস্টে। যাতে করে ইহুদিদের বদমায়েশির স্বীকার কেবল মুসলমানরাই হয়। এখানে আরো প্রমাণ লাগবে? দেখুন, জেরুজালেম দখলের পর সবার আগে কারা একে ইসরাইল বলে স্বীকৃতি দিয়েছে? আমাদের জানা আছে, সেটা জাতিসংঘ। সুতরাং ভাবনা তেমন জট পাকায় না। সহজেই মিলে যায়। আর মুসলমানের হিসাবে মিলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

এই মুহূর্তে এসে সংকট মূলত আমাদের। চিন্তাও আমাদের। পৃথিবীটাও আমাদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধও আমাদের বিপক্ষে। ভাবনা যাদের, নিরসন তাদের মাথা থেকেই বের করতে হয়। হলোকস্টকে যেমন এই বলে সম্বোধন করি- 'দ্য ফাইনাল সল্যুশন অব জুয়িশ প্রবলেম।'

আমেরিকার গোপন লজ্জা
ভিয়েতনামের যুদ্ধ

আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ ভিয়েতনাম যুদ্ধ। আমরা এখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের ওপর খানিক চোখ বুলাবো। দেখতে চেষ্টা করবো ভিয়েতনাম আর ভিয়েতনাম যুদ্ধকে।

আসলে এই যুদ্ধটা অনেক বেশি রকম মানবতাক্ষয়ী। চরম রক্তপাতের। নিরীহ মানুষের অপরিমেয় মৃত্যুর। একটা কথা মনে রাখা দরকার, আমাদের আজকের পাঠ যুদ্ধকেন্দ্রিক। এখানে আমরা সঠিক ইতিহাসটাই বের করে আনার চেষ্টা করবো। কমিউনিস্টদের একটা ইতিবাচক অবস্থান আমরা পাবো। এবং সাবাশ বলবো। কমিউনিজম মতবাদের ভেতরের কোনো কিছু আমাদের আলোচ্য না।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ১৯৫৯ সালে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ১৯৭৫ সালে। দীর্ঘকালব্যাপী একটা যুদ্ধ। গরিব খুব মরেছে। এবং সেইসাথে এও দেখেছে যে, মনোবল আর স্বাধীনতার ক্ষুধা একটা জাতিকে কদ্দুর এগিয়ে দেয়। ভিয়েতনাম এই যুদ্ধে দুর্বার বিজয়ী। অনেক প্রাণক্ষয়ের পর সবিশেষ একটা শক্তির স্বাক্ষর।

আমরা এই ফাঁকে ভিয়েতনাম সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। হ্যাঁ, ভিয়েতনাম এক ধরনের অভাগা রাষ্ট্র। ওই আদিমকাল থেকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিগ্রহের শিকার। চিনের জাঁতাকলে পিষ্ট। ভিয়েতনাম দেশটির ক্ষমতা বারংবার অদলবদল হয়েছে। এর থেকে ওর হাতে। এভাবে এভাবে। বিষয় হলো, এই চিনের হাতে থাকতে থাকতেই যখন খৃস্টীয় সন ১৮৬০, সমস্যা হলো তখন। ফ্রান্স ইন্দোচায়না দখল করে নেয়। এবার ভিয়েতনাম দখলের তদবির শুরু করে। এর জন্যে ফ্রান্সকে অপেক্ষা করতে হয় ত্রিশ বছর।

১৯০০ সালের কাছাকাছি সময় ফ্রান্স ভিয়েতনাম দখল করে ফেলে। ব্যাস, চলতে থাকে ক্ষমতার শাসন। এদিকে ধীরে ধীরে ভিয়েতনামে দেখা যেতে থাকে লেলিনবাদ, মার্ক্সবাদের আনাগোনা। সেই থেকে ১৯২৯ সালের দিকে এই টাইপের ইজমিক কিছু পার্টির উদ্ভব ঘটে। পরের বছর হো চিং মিংয়ের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। 'ইন্দোচায়না কমিউনিস্ট পার্টি' ব্যানারে তারা মাঠে নামে। এরপর দলটি তিনভাগ হয়ে লাওস, কম্বোডিয়া আর ভিয়েতনামে কাজ শুরু করে। তখন ব্যানার করে শ্রমিক পার্টির। পরবর্তীতে ৭৬ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে জয়ী হলে 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ভিয়েতনাম' নামটি ধারণ করে।

যাহোক, হো চিং মিংয়ের নেতৃত্বে এভাবে আন্দোলন চলে। ১৯৪৫ সালে তোপের মুখে ফ্রান্স ভিয়েতনাম সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। আর তখন ভিয়েতনামের পুতুল প্রেসিডেন্ট বাই দাও পদত্যাগ করে। কিন্তু পুনরায় প্যাঁচ বাঁধায় ফ্রান্স। তারা নিজস্ব অধীনে ভিয়েতনাম সরকার সাজানোর ইচ্ছা করে। আর বাই দাওকে তার প্রধান পদে নিয়োগ দেয়।

এবার মূলত স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হয়। মনে রাখতে হবে, এই যুদ্ধকে কিন্তু ভিয়েতনামযুদ্ধ বলে না। সেটা আরও পরে শুরু। অন্য ইস্যুতে।

তো ১৯৪৫ সাল থেকে একদম ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। এক পর্যায়ে ফ্রান্স ভিয়েতনাম থেকে পুরোপুরি হাত উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তবে চলে যাওয়ার আগে ভিয়েতনামকে দুই ভাগে ভাগ করে রেখে যায়। উত্তর ভিয়েতনাম আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম। ফ্রান্স ফিরতি পথ ধরে।

এরপর বিগত হয় পাঁচ বছর। হুম, সাম্যবাদীরা শাসন করে উত্তর ভিয়েতনাম, আর সাম্যবাদবিরোধীরা শাসন করে দক্ষিণ ভিয়েতনাম। ফলত ১৯৫৯ সালে দুই ভিয়েতনামের মধ্যকার মতবিরোধ আরও চাঙ্গা হয়। সাম্যবাদ স্বভাবতই দখল আরম্ভ করে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহ্য হয় না।

যুক্তরাষ্ট্র যে বহুবার অনৈতিকভাবে যুদ্ধে জড়িয়েছে সে তথ্য আমাদের সবার জানা আছে। তখন যুক্তরাষ্ট্র খেয়াল করে, সাম্যবাদ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চললে সমস্ত এশিয়ায় সাম্যবাদ-চিন্তা ঢুকে পড়বে। যা আমেরিকার জন্যে মোটেও সুবিধাজনক না। আর তাছাড়া আমেরিকা

চাইছিলো প্রথমে এশিয়ার দখলদারিত্ব এনে পরে বিশ্বের দখল। কিন্তু সাম্যবাদ তার জন্যে সমস্যার। সেই হিসাব করে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম তথা সাম্যবাদীদের পক্ষ নিলো। বিপুল নৃশংসতার দিকে হাঁটলো।

১৯৬০ সালে এক বড় আইনজীবীর নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক, সোস্যালিস্ট এবং মার্ক্সবাদের লোকেরা 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট'এ একত্র হয় দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের বিরুদ্ধে। বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। ১৯৬৫ সালে আমেরিকা বিপুল পরিমাণ সৈন্য পাঠায়। সম্পূর্ণ নিঃশ্বেস করার চিন্তা যদিও করে, আমেরিকার ভাগ্যে মূলত লেখা ছিলো একটা বিরাট পরাজয়। সেটাই ঘটে।

১৯৬৯ সালে আবার পাঁচ লক্ষাধিক সৈন্য আমেরিকা প্রেরণ করে। বর্বর দয়াহীন হয়ে নিক্ষেপ করে নাপাম বোমা। রাসায়নিক বোমাও মারা হয়। আর গণহত্যা তো চলেই। ১৯৬৯ সাল থেকেই যুদ্ধ বন্ধের আলাপ-সালাপ গোপনে চলতে থাকে। তিন বছর। তেইশে মার্চ ১৯৭৩ সালে চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

২৯ তারিখ আমেরিকা সৈন্য গুটিয়ে নেয়। কিন্তু দুই ভিয়েতনাম যুদ্ধ চালিয়েই যায়। এই যুদ্ধে বত্রিশ লক্ষ ভিয়েতনাম বাসিন্দা মারা যায়। আটান্ন হাজার মার্কিনি সৈন্য নিহত হয়। ৭৫ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ আগায়। এরপর দুই পক্ষই সমাধানে আসে। ৭৬ সালে উভয় ভিয়েতনাম মিলে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করে।

ম্যাকনামারা এক লোকের নাম। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৮ সালের মাঝের সময়ে এই ব্যক্তি আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলো। সে-ই যতো নির্বুদ্ধিতায় ভিয়েতনাম ধ্বংসের জন্যে নেমেছিলো। প্রাণ গিয়েছিলো হাজারো মানুষের। আসলে আমেরিকার আবিষ্কৃত 'ডোমিনি তত্ত্বে' এই লোকই সর্বাধিক নেচেছিলো। আহ, সাম্যবাদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে আমেরিকা সমস্ত কী পরিমাণে ধিক্কারই না হজম করেছিলো।

মজার ব্যাপার হলো, এই ম্যাকনামারাই জীবনের শেষমুহূর্তে লেখা আত্মজীবনীতে বলেছেন- ভিয়েতনাম আক্রমণ আমার জীবনের সবচাইতে বড় ভুল। হুম, আমরা তার কথা বিশ্বাস করেছি!

ইউরোপের কান্না
চেরনোবিল দুর্ঘটনা

এমন বড় দুর্ঘটনার জন্য পৃথিবীবাসী প্রস্তুত ছিলো না। হঠাৎ করেই বিস্ফোরণ। এবং অবলীলায় মানুষের মৃত্যু। চিরদিনের জন্য নির্বিকার হয়ে যাওয়া।

বর্তমানের দুনিয়ায় পারমাণবিক শক্তি এক বিরাট কিছু। যে দেশের শাসনে পারমাণবিক শক্তি মজুদ, সারা পৃথিবীর কাছে ওই দেশের একটা ভিন্ন ইমেজ সদা প্রত্যক্ষ। দেখা যায়, ওই দেশটাকে আমরা সবাই সমীহ করে কথা বলছি। যথাসম্ভব উচ্চবাচ্যহীন। সুতরাং বর্তমানে পারমাণবিক শক্তির উদ্ভাবন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই শক্তিটির উত্থান মানুষের মগজ থেকে। এখন যেহেতু মানুষ বলে কথা, তো কিছু ভুলের সম্ভাবনা খুব সহজেই অনুমেয়।

হ্যাঁ, আজকের আলোচনা সেই মানুষেরই ভুলের উপর। পুরোটাই অবশ্য মানুষের ভুল নয়। আমাদের অনবগত জায়গাও আছে খানিক। চলুন, কথা বলা যাক চেরনোবিল পারমাণবিক স্থাপনা এবং এটির দুর্ঘটনা নিয়ে। চেরনোবিল ছিলো ইউক্রেনীয় একটা গ্রামীণ নগর। সোভিয়েত শাসিত। এখানেই ছিলো ওই পারমাণবিক স্থাপনাকেন্দ্র।

১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল। চেরনোবিল। সময় রাত একটায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ওই কেন্দ্রটিতে মোট চারটি চুল্লি ছিলো। চতুর্থ চুল্লিতে বিস্ফোরণটি দুই দুইবার আঘাত হানে! ব্যাপার হচ্ছে, আসলে সমস্যার শুরু হয় আগের রাতেই। দুর্ঘটনার কিঞ্চিৎ আভাস পেয়ে সমস্ত নিরাপত্তা মনোযোগী হয় চার নম্বর চুল্লির দিকে। ফলে ডিফেন্স হয়ে পড়ে দুর্বল। সব ধরনের প্রতিরোধ গতি হারায়। আর কেন্দ্রের উপরের মেঘে পারমাণবিক একটা বিস্তার ধরা পড়ে। আর সেই মেঘ ছড়িয়ে পড়ে

ইউক্রেন আর তার আশপাশের কিছু সোভিয়েত ইউনিয়ন শাসিত শহরসমূহে। ফলে দেখা যেতে থাকে মানুষের উপরে অনেক ভয়ংকর পারমাণবিক শক্তিশালী আছর।

ওই যে বলেছিলাম মানুষের ভুল। ওই রাতের শিফটে যারা কর্মরত ছিলো, তারা চতুর্থ চুল্লিটির টারবাইনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শীতল পানি ব্যবহার করে। ফলে বাষ্প উৎপাদন বিলকুল কমে যায়, আর ভেতর উত্তপ্ত হতে থাকে। এক সময় বিরাট এক বিস্ফোরণ ঘটে। চার নম্বর চুল্লিটির উপরস্থ এক হাজার টনের ঢাকনাটি সরে যায়। বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার বিশ ঘন্টা বাদে বিস্ফোরিত চুল্লিতে বাইরের বাতাস ঢুকে যায় এবং সেখান থেকে শক্তিশালী আগুন সৃষ্টি হয়। যা পরবর্তী দশদিন পর্যন্ত ক্রমাগত জ্বলতে থাকে।

চেরনোবিলের ভাগ্য বড়ই কষ্টদায়ক। পারমাণবিকতার বিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। মানুষ পালায়। আর এই দুষ্ক্রিয়া তাড়া করে মানুষকে।

দুর্ঘটনার জন্য প্রথমত দায়ী করা হয় কর্তব্যরত কর্মীদের। এছাড়াও গবেষণায় বলা হয় যে, চুল্লির নিরাপত্তার কয়েক ক্ষেত্রই সে রাতে বন্ধ ছিলো। যার দরুণ চুল্লির শক্তি নির্গমন অত্যধিক বেড়ে যায়। যার জন্য মানবজাতিকে বিরাট চড়ামূল্য দিতে হয়।

এর বাইরেও আরও একটা কথার প্রচলন শোনা যায়। সে রাতে কিনা কিছু কর্মীকে ডিওটিতে বাধ্য করা হয়েছিলো। এই অর্থে দেখা যাচ্ছে, ব্যবস্থাপনাও দায়ী আছে কতোটুকু।

সাথে সাথেই সারা বিশ্বে পারমাণবিক জ্বালানি আবিষ্কারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সূচিত হয়। চেরনোবিল দুর্ঘটনার অভিশাপ ইউরোপের প্রায় পনেরোটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যায়। যেখানে জন্ম নেওয়া ২০ পার্সেন্ট শিশুই সুস্থ-সবল হয়ে জন্মে না। বিকলাঙ্গতা আর স্নায়ুর ভারসাম্যহীনতা এদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এই চেরনোবিল বিপর্যয়ের জন্যই আজকে সাত লাখের বেশি মানুষ থাইরয়েড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। যার এক লক্ষ মৃত্যুর কাছে মাথা পেতেছে এর মধ্যেই।

কিন্তু অধিক আশ্চর্যের কথা এই যে, হালের দুনিয়ায় দিনদিন এই পারমাণবিকতার উত্থানই আমরা দেখতে পাচ্ছি। পারমাণবিক

আবিষ্কারকেরা সমস্ত পৃথিবীকে প্রবল হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সবচাইতে দুঃখের কথা এই যে, এই সকল আবিষ্কারক পণ্ডিতরা চেরনোবিল দুর্ঘটনায় মৃতের একটা নগন্য সংখ্যা দাঁড় করায়। তখন মানবতা দেখি যে স্বয়ং মানবতাবাদীদের হাতেই মৃত্যু খোঁজে।

আমাদের কাছে একটা তথ্য আছে। ওই যে হিরোশিমা, তার উপরে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ। হাজার হাজার শিশুর ভগ্ন অংশ শরীর। আমাদের চোখে পানি এনে দেয়। এই হিরোশিমা থেকেও বেশি মানুষ মারা যায় চেরনোবিল দুর্ঘটনায়। এমনকি আজো সেই বিক্রিয়া পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান।

আমরা সাধারণ মানুষগুলো তাহলে কোথায় যাবো? নির্দ্বিধায় এটা এক সংকট। পারমাণবিক সংকট। মানুষের নিরাপত্তাবিষয়ক চিন্তা। সেই সাথে, এক অমানবিক যুদ্ধর দিকে হেঁটে যাওয়া। আমরা চাই, এমন চেরনোবিল আবার না দেখা দিক। পৃথিবীর মানুষ হাসুক। মূলত চাই প্রতিকার। নির্দয় অমানুষগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

ইউরোপা শহর

হাজারও স্মৃতির নগরী ইস্তাম্বুল

ইস্তাম্বুল শহরের পূর্ব নাম ছিলো বাইজেনটিয়াম। ঈসায়ি সাল গণনার ৬৬০ বছর আগে এই শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ইস্তাম্বুল ছিলো অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যের রাজধানী। ৩৩০ থেকে ৩৯৫ পর্যন্ত ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের, ৩৯৫ থেকে ১২০৪ এবং ১২৬১ থেকে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত ছিলো বাইজেন্টাইন, ১২০৪ থেকে ১২৬১ সাল পর্যন্ত ল্যাটিন এবং ১৪৫৩ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত উসমানি খেলাফতের রাজধানী।
ইস্তাম্বুল শহরটি ভূগোলের এক বিস্ময়শহর! এটিই পৃথিবীর একমাত্র শহর, যা দুটো মহাদেশে অবস্থিত; দু'দুটো সাগর একে আলাদা করেছে– কৃষ্ণ সাগর ও মর্মর সাগরঘেঁষা বসফরাস-প্রণালি। ঝুলন্ত সেতু হবার আগ পর্যন্ত যে প্রণালি বারবার পরাজিত করেছে উচ্চাভিলাষী সেনানায়কদের অসংখ্য হামলা আর ষড়যন্ত্র! বসফরাসের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বিখ্যাত 'গোল্ডেন হর্ন'। সব বাধা চূর্ণ করে ১৪৫৩ সালে যে মহানায়ক এই শহর পদানত করেন তার নাম সুলতান ফাতেহ মুহাম্মদ দ্বিতীয়।
ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান হচ্ছে তোপকাপি প্যালেস, তৈরি হয়েছিলো আজ থেকে সাড়ে পাঁচশো বছর আগে ১৪৬৫ সালে সম্রাট সুলতান ফাতেহ মুহাম্মদের নির্দেশে। এখানেই তিনি খেলাফতের রাজকার্য সম্পাদন করতেন। ১৯২৪ সালে এই প্যালেসকে জাদুঘরে পরিণত করা হয়। তোপকাপি প্যালেসে অনেকগুলো জাদুঘর আছে। একটি আছে ইসলামিক জাদুঘর। যেখানে মহানবীর চুল এবং উহুদের যুদ্ধে হারানো একটি দাঁতসহ বেশ কয়েকটি জিনিস আছে। মুসা আ.-এর হাতের যষ্ঠিও সংরক্ষিত আছে এখানে।

দেড় হাজার বছর আগে তৈরি হওয়া হাজিয়া সোফিয়া হচ্ছে তুরস্কের অন্যতম সেরা পর্যটন স্পট। ৫৩২ সালে বানানো এই হাজিয়া সোফিয়া প্রথমে ছিলো একটা চার্চ। ৯০০ বছর ধরে এটা ছিলো পৃথিবীর সবচে বড় চার্চ। ১৪৫৩ সালে সুলতান ফাতেহ্ মুহাম্মদ এই চার্চ দখল করে নেন এবং এটাকে মসজিদে পরিণত করেন। ৫০০ বছর মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের পর ১৯৫৩ সালে কামাল আতার্তুক হাজিয়া সোফিয়াকে জাদুঘরে পরিণত করেন।

নীল মসজিদ বা Blue Mosque হাজিয়া সোফিয়া থেকে মাত্র তিন-চার মিনিটের হাঁটাপথ। ৪০০ বছরের পুরনো এই মসজিদের দেয়াল, গম্বুজ, মিহরাব, কার্পেট অতুলনীয়! মসজিদের কিছু অংশ দর্শনার্থীদের জন্য, বাকি অংশ নামাজ আদায় করার জন্য উন্মুক্ত। সুলতান আহমেদ নীল মসজিদ তুরস্কের জাতীয় মসজিদ। ২০,০০০ হাতে তৈরি টাইলস দিয়ে সাজানো এই মসজিদ। এই টাইলসগুলো বানানো হয়েছে প্রায় ৫০ ধরনের টিউলিপ কারুকার্জে। দুইশোরও বেশি কাঁচের জানালা দিয়ে সবসময় বাইরের আলো আসছে। একসাথে ১০,০০০ মানুষ এই মসজিদে নামাজ পড়তে পারে।

ইসতিকলাল অ্যাভিনিউকে বলা হয় তুরস্কের সবচে জনপ্রিয় অ্যাভিনিউ। তিন কিলোমিটার লম্বা এই সড়কের দু'পাশে আছে বিখ্যাত সব বুটিক হাউস, ফাস্ট ফুড, বুকস্টোর, সিনেমা, মিউজিক শপ, আর্ট গ্যালারি, কফিশপ, পাব, রেস্টুরেন্ট। কোনো এক ছুটির দিনে প্রায় ৩০ লাখ লোক এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে হেঁটে যেতে সময় লাগবে ৪০-৪৫ মিনিট। উসমানি রাজত্বের সময়, এই অ্যাভিনিউ ছিলো অটোমেন বুদ্ধিজীবীদের আড্ডাখানা।

ইস্তাম্বুলের 'গ্র্যান্ড বাজার'কে বলা হয় পৃথিবীর সবচয়ে বড় বাজার। দুনিয়ার হেন কোনো জিনিস নেই যা এখানে পাওয়া যাবে না। ১৪৬১ সালে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ্র সময়ই এর গোড়াপত্তন। তারপর থেকে উসমানি খেলাফত যতো সমৃদ্ধ হয়েছে গ্র্যান্ড বাজারও সমৃদ্ধ হয়েছে ইস্ত াম্বুলের আকাশের নিচে।

১৯২২ সালে উসমানি খেলাফত ধ্বংসের আগ পর্যন্ত ইস্তাম্বুল ছিলো পৃথিবীর অন্যতম একটি ব্যবসাকেন্দ্র এবং মুসলমানদের মিলনস্থল। আজও অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন সে ইতিহাসকেই স্মরণ করে।

৬ মে ঐতিহাসিক বালাকোট

স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস

উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে বালাকোট একটি স্মরণীয় নাম। এর সঙ্গে জড়িত মুসলমানদের স্বাধীনতা, অস্তিত্ব ও জাগরণের ইতিবৃত্ত; পথহারা উম্মতের সঠিক পথের নির্দেশনা। ইংরেজ আমলের পরবর্তী সংঘটিত প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থান বালাকোটের চেতনার ফসল। বালাকোটের ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির মাধ্যমে সূচিত সংগ্রামের সিঁড়ি বেয়েই এ দেশের মুসলমানরা ফিরে পেয়েছিলো তাদের স্বাধীনতা।

বালাকোট আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সৈয়দ আহমদ রহ.। মুজাদ্দিদে আলফে সানির সূচিত সংস্কার ও সংগ্রামের ধারার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। তার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিলো মূলত দুটি উদ্দেশ্যে– এক. পারিপার্শ্বিক নানা প্রভাবে কলুষিত মুসলিম জাতির ঈমান-আকিদাকে শিরকমুক্ত করা। দুই. মুসলিম জীবনধারা ও জাগরণের অন্তরায় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। অস্তিত্ব হারাতে বসা মুসলিম জাতির জন্য তখন এ দুটি কর্মসূচি ছিলো অত্যন্ত যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয়।

মোঘল সালতানাতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উপমহাদেশের মুসলমানরা নিপতিত হয় চতুর্মুখী সমস্যায়। একদিকে জাঠ-মারাঠা-শিখ প্রভৃতি মুসলিমবিদ্বেষী শক্তিগুলোর ব্যাপক অভ্যুত্থান শুরু হয়, অন্যদিকে বাংলার শাসন ক্ষমতায় ইংরেজ বণিকদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সে সময়ে মুসলিম জনগণের অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক। মসজিদে আজান এবং জুমার জামাত বন্ধ হয়ে যায়। অবস্থার ভয়াবহতা সেই সময় সৈয়দ আহমদ শহিদ রহ.-কে আন্দোলনের পথে তাড়িত করে।

তিনি প্রথমে মুসলিম জনগণের ধর্মীয় সংস্কারের লক্ষ্যে ব্যাপক তাবলিগি সফর শুরু করেন। এই যাত্রাপথে তিনি বাংলার যুবকদেরও তার আন্দোলনে শরিক করেন। বাংলাদেশ থেকেও অনেক মুজাহিদ এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে মাওলানা ইমামুদ্দিন বাঙালি ও সুফি নূর মুহাম্মদ ছিলেন শীর্ষপর্যায়ে। ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের এক পরদাদা গাজী আশেকুল্লাহও ছিলেন এ পর্যায়ের এক সংগ্রামী আলেম। দুবছর এগারও মাসের হজের সফর সমাপ্ত করে সৈয়দ আহমদ রহ. তার জন্মস্থান রায়বেরেলি পৌছেন। দেশে এসে তিনি তার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন সর্বত্র। জনগণের জন্য মুক্ত স্বাধীন দেশে আল্লাহর বন্দেগি করার মতো মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রত্যয় নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে তার আন্দোলনে জড়াতে থাকে।

এ সময় ব্যাপক গণসংযোগের দ্বারা তিনি প্রায় ছয় হাজার সঙ্গী-সাথী সংগ্রহ করেন। তাদের সংগঠিত করে সীমান্ত এলাকায় চলতে থাকা মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ইংরেজ রাজশক্তির মদদপুষ্ট শিখ রাজার শোষণ প্রতিরোধকল্পে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। শিখ রাজা রঞ্জিত সিংকে প্রথমে পত্র মারফত মুসলিম নির্যাতন বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। শিখ রাজা পত্রের কোনো জবাব না দিয়ে মুজাহিদদের কাফেলাকে শায়েস্তা করার জন্য সরদার বুধ সিংয়ের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে এটাই ছিলো শিখদের সর্বপ্রথম মোকাবিলা। এতে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। এরপর 'হাজারা' নামক স্থানে দ্বিতীয়বার সংঘর্ষ হয়। এতেও শিখরা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়। এই বিজয়ের ফলে মুসলমানদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়।

এসব যুদ্ধের পেছনে কারণ ছিলো মুসলমানদের জীবন নিপীড়নমুক্ত করা, ইংরেজ ও ইংরেজপোষ্য শাসকদের কাবু করা। সম্প্রদায়গতভাবে শিখদের সঙ্গে লড়াই করা তার লক্ষ্য ছিলো না। সে সময় মুজাহিদিন ও উপজাতীয় সর্দারদের এক সমাবেশে সৈয়দ আহমদ শহিদকে 'আমিরুল মোমিনিন' করে ইসলামি খেলাফতের গোড়াপত্তন করা হয়। মুজাহিদ বাহিনীর আন্দোলন এতে নতুন মোড় লাভ করে।

কিন্তু সৈয়দ আহমদ রহ.-এর এই আন্দোলনে উপজাতীয় পাঠানদের সমর্থন ছিলো না। কারণ, শিখদের সঙ্গে এদের নানা ধরনের বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত ছিলো। যুগ যুগ ধরে তারা গদি দখল করে সাধারণ জনগণকে শোষণ করে আসছিলো। তাই সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে তাদের একটি সুস্পষ্ট বিরোধ জন্ম নেয়। ফলে তারা শিখদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গোপন চক্রান্তে মেতে ওঠে। সংঘটিত হয় 'সিঁদুর' যুদ্ধ। কিন্তু এই যুদ্ধে মুজাহিদদের আংশিক পরাজয় ঘটে। নানামুখী প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের কারণে তারা কিছুটা দমে যান।

এরই মধ্যে ঘটে এক করুণ ঘটনা। একদিন মুজাহিদরা এশার নামাজ আদায় করছিলেন। এ সময় তাদের ওপর এক অতর্কিত হামলা করা হয়। এতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুজাহিদ নির্মমভাবে শহিদ হন। এই ঘটনায় মুজাহিদদের মনোবল ভেঙে যায়। সৈয়দ আহমদ রহ. প্রত্যেককে নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু অনেকেই তাকে ছেড়ে যেতে রাজি হননি।

অবশিষ্ট মুজাহিদদের নিয়ে সৈয়দ আহমদ রহ. পেশোয়ার উপত্যকা থেকে কাগানের পার্বত্য এলাকা দিয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে বালাকোটের কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সর্দার শের সিংয়ের নেতৃত্বে একটি বিরাট শিখ সৈন্যবাহিনী এসে সমগ্র এলাকা ঘিরে ফেলে। মূলত পাঠানদেরই একটি গ্রুপ শিখদের এখানে নিয়ে আসে। ফলে বালাকোটের ময়দানে সংঘটিত হয় চূড়ান্ত ও শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে মুজাহিদ বাহিনী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। কিন্তু কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় সৈয়দ আহমদ রহ., শাহ ইসমাঈল শহিদ রহ.সহ প্রায় দুশো মুজাহিদ শহিদ হন। দিনটি ছিলো ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে।

এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয় দীর্ঘ জিহাদি আন্দোলনের এক অধ্যায়। দীর্ঘ সংগ্রামের প্রবাহিত ধারা এখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। রক্তের আখড়ে লেখা হয় বালাকোটের ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির কথা। তবে সৈয়দ আহমদ রহ. তার লক্ষ্যার্জনে অনেকাংশেই সফল হয়েছিলেন। সীমান্তের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের মানুষরা শিখদের নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছিলেন। উপরন্তু পেশোয়ারকেন্দ্রিক একটি ইসলামী খেলাফত কায়েম করে চার বছরাধিককাল তা পরিচালনা করে সফল দৃষ্টান্তও তিনি

স্থাপন করেন। যা পরবর্তী যুগের ঈমানদীপ্ত মুসলমানদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকে।

পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সিপাহী বিপ্লব, রেশমি রুমাল আন্দোলন, আজাদি আন্দোলন, দেওবন্দ আন্দোলন, আলীগড় আন্দোলন, ফরায়েজি আন্দোলনসহ প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিপ্লবই বালাকোটের প্রেরণা ফসল। এজন্য বালাকোটের সেই ত্যাগ চিরকালই ভাস্বর হয়ে থাকবে।

বিস্মৃত ইতিহাসের হাতছানি

চিন দেশে ইসলামের সূচনা

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির পথ নির্দেশনার লক্ষ্যে যুগে যুগে অসংখ্য নবী এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। নবুয়তের এ সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটে আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগত-অনাগত সমস্ত মানুষের নবি। নবির অনুপস্থিতিতে তার উম্মতকে বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবুয়তের দায়িত্ব এই নবিরই উম্মতের উপর অর্পণ করেন।

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিরা সর্বপ্রথম সেই মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এ ক্রমধারায় আল্লাহর রাসুলের কিছু সাহাবি ভারত উপমহাদেশ পেরিয়ে চিনে আগমন করেন।

ইসলামের বহু আগে প্রাচীনকাল থেকেই চিন দেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ ছিলো। চিনের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো। বাণিজ্যের সূত্র ধরে বঙ্গসহ উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আরব বণিকদের জাহাজের যাতায়াত ছিলো।

সাহাবি আবু ওয়াক্কাসের রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে তিনজন সাহাবি ও কিছু সংখ্যক হাবশি মুসলমানদের একটি প্রচারক দল চিনে গমন করেন। দলের আমির সাহাবি আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তার প্রতিষ্ঠিত কোয়ান্টাং মসজিদটি এখনো সমুদ্র তীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের অদূরেই তার কবর রয়েছে। বর্তমানে সেই মসজিদটি দাওয়াত ও তাবলিগের মারকায হিসেবে পরিচিত।

অন্য দুজন সাহাবি চিনের উপকূলীয় ফু-কিন প্রদেশের চুয়াংচু বন্দরের নিকটবর্তী লিং পাহাড়ের ওপর সমাহিত রয়েছেন। চতুর্থজন সাহাবি চিনের অভ্যন্তরে চলে গিয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় চিন মহাদেশে ইসলামের সূচনা।

রাসুলের এই সাহাবিরা চিনে এসে প্রথমে ব্যবসা শুরু করেন। আল্লাহর রাসুলের সাহাবিরা হলেন বিক্রেতা আর চিনা জনগণ ক্রেতা। এভাবে কিছুদিন চলার পর চিনের বড়ো বড়ো শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ চিনের রাজ দরবারে অভিযোগ পেশ করে, আরবের কিছু বণিকদের কারণে আমাদের ব্যবসা লাটে উঠেছে। আমাদের রাস্তায় বসার উপক্রম হয়েছে। অচিরেই ব্যবস্থা না নিলে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবো। চিনের রাজ দরবার থেকে আরব বণিকদেরকে বহিষ্কার করার ফরমান জারি করা হলো।

সাথে সাথে পুরো চিনে তোলপাড় শুরু হলো। জনগণ রাজদরবারের এই ফরমান শুনে ফুঁসে উঠলো। তারা আরব বণিকদেরকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে এলো। চিনের রাজা তো এ অবস্থা অবলোকন করে নড়েচড়ে বসলো। রাজদরবারের বিস্ময়ের শেষ রইলো না। বিক্ষোভকারীদেরকে তলব করে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। রাজতদন্ত শুরু হলো। কী কারণে চিনের সাধারণ জনগণ আরব বণিকদের পক্ষাবলম্বন করলো, এর কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে বটে।

অবশেষে জানা গেলো, আগত আরব বণিকদের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রভাব, ব্যবসায় সততা, ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয়, ভেজাল পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, কোনো কারণে মাল ফেরত দিতে চাইলে খুশিমনে তা পূর্ণ মূল্য ফেরত দিয়ে ফেরত নিয়ে নেওয়া ও ভোক্তাদের সাথে আরব বণিকদের সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদির ফলে চিনের সাধারণ জনগণ এদের প্রতি প্রবলভাবে মুগ্ধ।

অপরদিকে চিনের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি কর্তৃক হঠকারিতা, মজুতদারির সীমাহীনতা, অতিরিক্ত মুনাফার লোভ, ভেজাল পণ্যের সয়লাব, সময়মতো জরুরি পণ্য সরবরাহে ব্যর্থতা ও গ্রাহক কিংবা সাধারণ ক্রেতাদের দুর্ভোগ লাঘবে সচেষ্ট না হওয়ার কারণে তারা এদের প্রতি চরম অতিষ্ঠ।

এ তথ্য উদঘাটিত হওয়ার পর চিনের রাজ দরবারের পক্ষ থেকে আরব বণিকদের বহিষ্কারের ফরমান প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জয় হয় ইসলামের। জয় হয় প্রিয় নবির সাহাবিদের উচ্চমানের আখলাকের। ইসলামে ঘোষিত ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নীতিমালার ইতিবাচক প্রতিফলন চিনবাসীদের চোখ খুলে দেয়। আরব বণিকবেশধারী প্রিয় নবির সাহাবিদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে চিনের মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

এভাবে চিনে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়। সাহাবিরা তাদের সঙ্গী-সাথীদের সাথে নিয়ে চিনের জনসাধারণের সাথে মিশে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন।

এরপর কালের পরিক্রমায় দীর্ঘদিন যাবত ইসলামের দাওয়াত ও এর মেহনত দুর্বল হতে হতে একপর্যায়ে চিন থেকে ইসলাম বিদায় নেয়। প্রিয় নবির সাহাবিরা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু হয়। জাতি ও শ্রেণিগত বিভিন্ন মানুষের আবাস গড়ে উঠে চিনে। বৌদ্ধ থেকে নাস্তিক্যবাদ প্রবল হয়ে উঠে। যার প্রমাণ বর্তমান চিনের অবস্থা। এখন সেখানে কমিউনিস্টের শাসন চলছে। অনেকদিন ধরে কমিউনিস্ট মতবাদ দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে চিন শাসন করে আসছে। চিনের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৩৫ কোটির উপরে। এর প্রায় ৪৮ কোটি মুসলমান।

আল্লাহ তাআলা হজরতজি মাওলানা ইলিয়াস রহ. এর মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলিগের নামে পুনরায় ইসলামের দাওয়াতের মেহনত চালু করার পর আবারো চিনে সেই মেহনত শুরু হয়। কীভাবে তা শুরু হয়- এর ঘটনা আরও বিস্ময়কর।

ইসলামের দাওয়াত, শিক্ষা ও এর মেহনত না থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন চিনে সামান্য সংখ্যক কিছু মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়েও কোনো জ্ঞান ছিলো না। কালিমা, নামাজ, হজ্জ- এ কয়েকটি নাম শুধু বলতে পারতো। কীভাবে তা পালন করতে হয়- তাও জানতো না। একবার চিনের কয়েকজন মুসলমান হজ্জের নিয়ত করে। কিন্তু হজ্জ কীভাবে করতে হয়, এর জন্য কোথায় যাওয়া লাগে- এটাও তাদের জানা ছিলো না। হজ্জের স্থানে যাওয়ার নিয়তে টিকিট বুকিং দিতে গেলে তাদেরকে বলা হলো- তোমরা দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশ থেকে

আরবের বিমানে যাত্রা করো। পরে তারা বাংলাদেশে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ভাষা না বোঝার ফলে কাকরাইল মারকাজের পক্ষ থেকে নিয়োজিত এস্তেকবালের সাথীরা তাদেরকে সরাসরি মারকাজে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে তাদেরকে নির্দেশনা সহকারে চার মাসের সফরে যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাথে কয়েকজন বাংলাদেশি সাথী ছিলেন। তারা চাইনিজ ভাষা বুঝতেন না। ইশারা-ইঙ্গিতে সবই চলতে লাগলো। এদিকে আসল রহস্য এখনো অজানা। চিনা মুসলমানরাও কিছু বুঝছে না। তারা এই সফরকেই হজ্জ মনে করলো।

এরই মাঝে কানাডা প্রবাসী এক ইঞ্জিনিয়ার- যিনি চাইনিজ ভাষা বুঝতেন, তিনি কাকরাইলে আসেন। তাকে হজ্জরেশী সেই চিনা জামাতের কাছে প্রেরণ করা হলে এতোক্ষণ লুকিয়ে থাকা গোমড় ফাঁস হয়। তখন চিনা মুসলমানরা আগে দীন ও দীনের মেহনত শিখে এরপর হজ্জ করার নিয়ত করেন।

এরপর চিনে দাওয়াত ও তাবলিগের জামাত প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘদিনের বিরতির পর আবার চিনে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এর ধারাবাহিকতায় টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইজতেমায় প্রায় ৮০০০ চাইনিজ মুসলমান উপস্থিত হন। তাদের জন্য আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়।

উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়
নিজ দেশে পরদেশি

পরাবাসী চিনের জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসরত উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ে চিনের সরকার কর্তৃক যে দমন পীড়ন নীতি অব্যাহত রয়েছে, তা জানাতেই আমাদের এবারের আয়োজন।

চিনের মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাস

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময় থেকেই চিনে মুসলিমদের আবির্ভাব। বাইজান্টাইন, রোমান, এবং পারসিকদের উপর জয়লাভ করার পরই, হজরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৫০ ঈসায়ি (২৯ হিজরি) সনে সাদ ইবনে আবি ওক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে চিনে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এমনকি তার অনেক আগেই হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় আরবের বণিকরা সিল্ক রুটে বাণিজ্য করতে আসা-যাওয়ার সময়ই চায়নাতে ইসলাম নিয়ে আসে– যদিও এটি ছিলো একটি অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া মাত্র।

এর পরে উমাইয়া এবং আব্বাসীয় খলিফাগণও তাদের শাসনামলে ৬টির মতো প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এবং চাইনিজরা তাদের সকলকেই সাদরে বরণ করে নেয়। সাং শাসনামলে (৯৬০-১২৭৯) চায়নায় মুসলিমরা ব্যবসায়িকভাবে অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। তারা তৎকালীন আমদানি ও রফতানির সিংহভাগই নিয়ন্ত্রণ করতো। এমনকি তারা অনেক বড় বড় অফিসিয়াল কাজেও অধিষ্ঠিত ছিলো।

তাদের পাশেই বাস করতো হান সম্প্রদায়। তারা হানদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করতো। আস্তে আস্তে

চায়নিজ সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের নাম অনেকটা চায়নিজ নামের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেলো। নোমান মোহাম্মদ থেকে 'মো' হাসান থেকে 'হা' হুসাইন থেকে 'হু' ধারণ করল। তাদের পোশাক পরিচ্ছদে হালকা পরিবর্তন হলো। কিন্তু তাদের ঐতিহ্যবাহী টুপি, পাগড়ি ও হালাল খাবার গ্রহণে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

চায়নিজ মুসলিমরা পরিচিত ছিলো সুশৃঙ্খল জাতি হিসেবে, কিন্তু এ জন্য অমুসলিম চায়নিজদের সাথে তাদের কোনো ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা সংগঠিত হয়নি। তারা আস্তে আস্তে অনেক মসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলো। ১৯৭০ সালের এক সমীক্ষা মতে, চায়নাতে প্রায় ৩০ হাজারের মতো মাদরাসায় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী ছিলো। আর ১৯৯৮ সালের সমীক্ষা মতে চায়নাতে প্রায় ৩২,৭৪৯টি মসজিদ ছিলো। যার মধ্যে জিনজিয়াং প্রদেশেই ২৩ হাজার অবস্থিত। বর্তমানে চায়নাতে প্রায় ১০টির বেশি বিভিন্ন গোত্রীয় মুসলিম রয়েছে। এদের মধ্যে তুর্কি, তাজিক, তাতার, পাওয়ান, উইঘুর এবং উজবেক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উইঘুর মুসলিমদের পরিচিতি

চিনে বসবাসরত মুসলিমদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস রয়েছে। এদের মধ্যে উইঘুর মুসলিমদের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ। তারা চিনের পশ্চিম অঞ্চলের জিনজিয়াং প্রদেশে বাস করে। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। তারাই এ এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের রয়েছে নিজস্ব নেতা, আধুনিক তুর্কি-আরবি লিপি এবং তাদের ধর্ম ইসলাম যা তারা গ্রহণ করেছিলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তাদের প্রধান শহর হলো কাশি (কাশগর) যা প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এবং জিনজিয়াং-এর রাজধানী উরুমসকি যা পুরোপুরি স্থলবেষ্টিত। তাদের পাশে বাস করে হান জাতি যারা তাদের তুলনায় সংখ্যায় কম।

সমস্যার শুরু

১৯৪৯ সালে যখন চিন একটি গণপ্রজাতন্ত্রে রূপ নেয় তখন থেকেই বড় ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হতে লাগলো। এভাবে একটা সময় যখন

চিনের কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আরোহণ করলো, তখন তারা মুসলমানদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার/নির্যাতন শুরু করলো।

উইঘুরদের উপর অত্যাচারের বিবরণ

বহিরাগত হওয়ার যন্ত্রণা যে কতো ভয়াবহ তা আব্দুল্লাহ আহমেদ জানেন। প্রায় এক দশক আগে তিনি চিন থেকে হিজরত করে দুবাইতে চলে যান। বর্তমানে তিনি দুবাইয়ের একজন সফল ব্যবসায়ী। কিন্তু দুবাই সরকার বহিরাগতদের '২য় সারির' নাগরিকের মর্যাদা দেয়। তারা সেখানে কোনো জমি-জমা কিনতে পারবে না। আবার দেশে ফিরলেও তেমন কোনো শান্তি নেই, কারণ চিনে সে একজন বহিরাগত হিসেবে বিবেচিত হয়। সম্প্রতি সে চিনে এসেছিলো। জিনজিয়াং বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তার ওপর অত্যাচার, নির্যাতন শুরু হয়। 'হোটেলে পর্যন্ত আমাদের সিট দিতে চায় না', আহমেদ বলেন।

তার কাছে চায়নিজ পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র উইঘুর হওয়ার কারণেই তাকে এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি বলেন, আমার তখন এটাই অদ্ভুত বিষয় মনে হয় যে, আমাদের নিজ দেশেই বহিরাগত মনে করা হয়। তিনি আরও বলেন, এ তো গেলো সামাজিক অত্যাচারের ফিরিস্তি। এছাড়া ধর্মীয় নিপীড়ন আরও চরম আকার ধারণ করেছে। সংবাদ সংস্থা AP-এর ভাষ্যমতে, চায়নিজ সরকার উইঘুরদের সিয়াম সাধনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যদিও এ ব্যাপারে সরকারের ভাষ্য এই, এটা করা হচ্ছে তাদের স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করে।

কিন্তু অন্যান্য ভাষ্যমতে জানা যায় এটা মুসলিমদেরকে সেক্যুলার করে দেয়ার জন্য একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, যেটা অবশ্যই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। স্থানীয় সরকার তাদের রোজা পালনে নিরুৎসাহিত করে তাদের ওয়েবসাইটে অনেক পোস্টার ও ছবি প্রকাশ করেছে। ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা তাদের বাড়িতে দিনের বেলা খাবার পাঠিয়ে তাদের সিয়াম ভাঙতে বাধ্য করছে। অবস্থা শুধু এতোটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মাঝে মাঝে সালাত আদায় করলে ও সিয়াম পালন করলে তাদের চাকরিও হারাতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের পোমোনা কলেজের নৃ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং উইঘুর বিশেষজ্ঞ গ্লাডেনির মতে, এটি মুসলিমদের সেক্যুলার করতে একটি ভ্রান্ত পলিসি এবং এটা অবশ্যই সমালোচনা বয়ে আনবে এবং আমি মনে করি, এতে মুসলিমরা ক্ষমতাসীন সরকারের ওপর অনেক অসন্তুষ্ট হবে তাদের ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করার জন্য।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উইঘুরে অবস্থিত বিভিন্ন মাদরাসা বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারের দাবি এসব মাদরাসায় জিহাদের পাঠদান এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ধ্যান-ধারণা শিক্ষা দেয়া হয়।

উইঘুরদের জনশূন্য করার চক্রান্ত গত ৫০ বছর ধরে সরকার উইঘুরদের পাশাপাশি বসবাসরত হান চাইনিজদের বেশি করে পশ্চিম জিনজিয়াং প্রদেশে প্রেরণ করছে। তারা এ নীতি প্রয়োগ করছে 'যুবক হান পশ্চিমে যাও'। ১৯৪৯ সালের এক সমীক্ষা মতে, এখানে সমগ্র জনসংখ্যার ৪-৫% ছিলো হান সম্প্রদায়। কিন্তু বর্তমান সরকারের ভাষ্যমতে জিনজিয়াং প্রদেশে প্রায় ৪০% হান সম্প্রদায় বাস করছে। এক পশ্চিমা গবেষকের মতে, অবস্থানরত পুলিশ সদস্য ও সেনাবাহিনীতে প্রায় ৬০-৬৫% হান রয়েছে।

সরকারের দমন পীড়নের ফিরিস্তি এ ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় অত্যাচার উইঘুর মুসলিমদের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে হান সম্প্রদায় ও উইঘুর মুসলিমদের মাঝে এক বড় ধরনের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। যাতে প্রায় ২ শত মানুষ নিহত হয়। উইঘুর অ্যাক্টিভিস্টদের মতে এটি ছিলো পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। চায়না সরকার পরে সেখানে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ নিয়োগ করে এবং ইসলামের বিধিনিষেধ পালনের ওপর আরও কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দোহাই

৯/১১ এর পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে তথাকথিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধ শুরু করেছে, চায়নিজ সরকারও এ পদ্ধতি যাকে বলে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করেছিলো। সরকারের ভাষ্যমতে, তারা তালেবান ও আল কায়েদার সাথে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু

পর্যবেক্ষকদের মতে 'তালেবানদের সাথে সম্পর্ক' এটা মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রফেসর গ্লাডনির মতে, সন্ত্রাস বিষয়ক সাক্ষ্য প্রমাণ যা করেছে তা খুবই নগণ্য। এটা এই কথা প্রমাণ করতে সক্ষম নয় যে, তাদের সঙ্গে তালেবানসহ অন্যান্য গ্রুপগুলোর সংযোগ রয়েছে।

মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা এবং উইঘুর নেত্রীর বক্তব্য

উইঘুর নেত্রী রাবিয়া কাদির যিনি সারা বিশ্ব চষে বেড়াচ্ছেন উইঘুরদের দাবি আদায়ের লক্ষে আন্তর্জাতিক সংহতি আদায়ের জন্য। যিনি বর্তমানে জার্মানিতে অবস্থান করছেন। সম্প্রতি সেখানে একটি গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন, 'চিনা কর্তৃপক্ষ কীভাবে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে, কীভাবে আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গ্রেফতার হচ্ছে এবং কারাগরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, ইসলামি দেশ ও সংগঠনগুলোকে আমি ইতোমধ্যে এ বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করেছি। আমি তাদের বলেছি কীভাবে পবিত্র রমজানে চিনা সৈনিকরা উইঘুর মুসলিমদের বাড়ি প্রবেশ করে এবং লোকদের মদ ও খাবার গ্রহণে বাধ্য করে। দেশে নতুন যে আইন করা হয়েছে তার শর্তমতে কেবল আশি বছরের বেশি বয়সীরাই মসজিদে যেতে পারবে। আমি চাই ইসলামি গোষ্ঠী ও জাতিগুলো আমাদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিক। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা আমাদের কোনো সাহায্য করেনি।

মিয়ানামারে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর সে দেশের সরকারের আচরণের নিন্দা জানিয়ে ৬০টিরও বেশি দেশ একটি দলিলে স্বাক্ষর করেছে। অথচ আমাদের দেশে ১০ হাজারের বেশি লোক আটক ও নিখোঁজ থাকলেও এমন কোন পদক্ষেপ দেখা যায়নি। আমি আশা করি আরব দেশগুলো আমাদের সাহায্য করবে। আমি চাই, তারা জিনজিয়াং-এ আসুক এবং যে পরিস্থিতি বুঝবেন তা সারাবিশ্বের মানুষের সঙ্গে শেয়ার করুন। আমি আশা করি, মুসলিম দেশের সরকারগুলো উইঘুর সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য ও আমাদের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে চিনের সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন।

বড় আক্ষেপের বিষয় হলো, এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামি দেশগুলো আমাকে বা বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেসের অন্য সদস্যদের সাক্ষাত করতে দিচ্ছে

না। কারণ, চিন সরকার তাদের বলেছে, আমরা সন্ত্রাসী সংগঠন এবং বেইজিং যা বলেছে তা তারা বিশ্বাস করেছে। চিন ২২ জনের নামের একটি তালিকা বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছে। সে তালিকায় প্রথমেই আছে আমার নাম। সে জন্য ইসলামিক দেশগুলো আমাকে সে দেশে ঢোকার বা কোনো ধরনের কাজ করার সুযোগ দিচ্ছে না। অথচ অন্য পশ্চিমা দেশগুলো আমাদের সবসময় প্রবেশাধিকার দিচ্ছে।

আমাদের সভাপতি (রেজা বেকিন) বর্তমানে তুরস্কে অবস্থান করছেন। তিনি সৌদি আরবে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনোক্রমে তিনি সেখানে যেতে সক্ষম হননি। কারণ, চিনের সরকারের তালিকায় তার নামও আছে। আমি বিশ্ববাসীর কাছে, বিশেষ করে ইসলামি জাতিগুলোর কাছে আশা করি, তারা আমাদের পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করবে এবং বেইজিং যা বলছে তা বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকবে। আমাদের মুসলিম ভাইদের উচিত হবে না কেবল চিনা নীতির অনুসরণ করা। আমরা কেবল মুসলিম হওয়ার অপরাধে চিনা সরকার উইঘুর মুসলিমদেরকে প্রতিনিয়ত হত্যা করেছে। আমি চাই ইসলামিক দেশগুলো এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হোক।

আমরা যখন নিজ দেশ থেকে পালিয়ে আসি তখন পশ্চিমা দেশগুলোতে আমাদের আশ্রয় পাওয়া অনেক সহজ। কিন্তু আমরা যখন কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করি তখন তারা আমাদেরকে চিনের কাছে ফেরত পাঠায়। আমরা সাধারণত ইসলামি অনুশাসন মেনে চলি। ঐ ভূখণ্ডটি উইঘুর জনগোষ্ঠীর মানুষের স্বত্বাধীন এবং এখানকার জনগণ ইসলামে বিশ্বাস করে।

আমরা সালাত আদায় করি এবং ইসলামি অনুশাসনগুলো মেনে চলি। আমরা রমজান মাসে সিয়াম সাধনা করি। যদিও এটি চিনা নীতির বিরুদ্ধে। তবুও আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই যাবো। যদি আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি তবে আমাদের লক্ষ্য হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা। হান চাইনিজ ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীগুলো যারা এ অঞ্চলে বসবাস করতে চায়, তাদের আমরা স্বাগত জানাবো। আমরা একটি শান্তিপূর্ণ ন্যায়ানুগ সমাজ চাই। কারণ, আমরা চিনা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।

বাগদাদের করুণ কাহিনি

তাতার তাণ্ডবের ক্যানভাস পাঠ

৬০৩ হিজরি পরিক্রমা। চিনের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গোলিয়া। এখান থেকেই উৎপত্তি ঘটেছিলো তাতারদের। এ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর প্রথম নেতা 'চেঙ্গিস খান'।

'চেঙ্গিস খান' শব্দটির অর্থ 'রাজাদের রাজা'। তবে তার আসল নাম 'তিমুজিন'। এই তিমুজিন তার জীবনের শুরু থেকেই রক্তপ্রিয় এবং সুকঠিন মনোবলের সামরিক নেতা বা যুদ্ধকমান্ডার হিসেবে তার অঞ্চলে লোকমুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানুষকে তার পাশে কিংবা বলয়ে ধরে রাখার বিস্ময়কর শক্তি ও প্রতিভা নিয়ে এ লোকটির জন্ম হয়েছিলো।

চেঙ্গিস খানের শাসনামলেই খুব দ্রুত তাতারদের সাম্রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার রাজ্যসীমানা পূর্ব দিকে কোরিয়া অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে ইসলামি সালতানাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। ওদিকে উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে চীন সাগর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। সব মিলিয়ে তার শাসনসীমানায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো আজকের চিন, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, থাইল্যান্ড এবং সাইবেরিয়ার কিছু অংশ হয়ে লাওস, মিয়ানমার, নেপাল এবং ভুটান পর্যন্ত।

তাতার কিংবা মঙ্গোল বংশ- এদের সবার প্রধান উৎপত্তিস্থল চিনের উত্তরাঞ্চলে গোবি মরুভূমি থেকে। তাতার এদের মূল বংশের নাম। এ বংশ বা গোত্রটি বিভিন্ন উপগোত্রে বিভক্ত ছিলো। মঙ্গোল, তুর্ক, সালাজিকা প্রভৃতি এ প্রধান গোত্র থেকে শাখা-প্রশাখা ছিলো। তবে সামগ্রিকভাবে চেঙ্গিস খানের কর্মযজ্ঞ ও অভিযানসমগ্র বুঝানোর জন্য এটিকে মঙ্গোল সাম্রাজ্য বলা হয়ে থাকে।

তাতার বা মঙ্গোলদের কি কোনো ধর্মবিশ্বাস ছিলো? ইতিহাসবিদরা এর নানা উত্তর দিয়েছেন। তবে গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে, চেঙ্গিস খান মূলত বিভিন্ন ধর্ম থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে জোড়া লাগিয়ে নতুন মতবাদ বা ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন। ইসলাম, খ্রিস্টবাদ, বৌদ্ধ মতবাদ এবং আরও অন্যান্য প্রাচীন ধর্মমত থেকে বিভিন্ন অংশ এক করে তিনি তার এবং তার অনুসারীদের জন্য ধর্ম নির্ধারণ করেছিলেন। চেঙ্গিস খানের পক্ষ থেকে তার অনুসারীদের জন্য রচিত একটি গ্রন্থ ছিলো, যার নাম 'আল ইয়াসাহ বা আল ইয়াসাক'।

তাতারদের এ তাণ্ডবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অধ্যায়ই যেমন হৃদয়বিদারক তেমনিভাবে তা বিস্ময়করও বটে। এ বিস্ময়ের রহস্য হয়তো এখনও পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি।

মাত্র অল্প ক'দিনের তাতার আগ্রাসন ও অভিযানের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো গোটা পৃথিবীর ইসলামি সালতানাত। বিশ্বময় আতঙ্ক ও নৈরাজ্যের ভীতিকর বাহিনী হিসেবে তাতারদের নাম-দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো পাড়া-মহল্লার অলিগলিতেও। কিন্তু কী ছিলো তাদের এমন ভয়ানক তাণ্ডবের মূল উৎস? অতীত-গবেষকরা এর বিভিন্ন কারণ খুঁজে বের করেছেন। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি- তাতারবাহিনী খুব দ্রুত মানুষের মধ্যে নানা কৌশল ও গুজবে ভয় ঢুকিয়ে দিতো। তারা ছিলো সুশৃঙ্খল এবং কঠোর নীতিবদ্ধ, নেতার প্রতি অনুগত।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সে সময়ে পৃথিবীতে শক্তি কিংবা পরাশক্তি ছিলো মূলত তিনটি। প্রথমত মুসলিম সাম্রাজ্য। মুসলমানরা সে সময়ে ছিলো গোটা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ জাতি এবং শক্তি। যদিও ক্রমে ক্রমে তা দুর্বল হয়ে আসছিলো কিন্তু তখনও এর প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিলো। এ শক্তিকে হেয় করার মতো কোনো দম্ভ তখনও এর আশেপাশে ভিড়তে পারতো না। মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অলসতা ও উদাসীনতার পরও অন্য ধর্ম ও শক্তির লোকেরা জানতো এবং বিশ্বাস করতো, যে কোনো সময় মুসলমানরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে এবং এক বিস্ময়কর উত্থানের শক্তিবীজ তাদের ভেতরেই লুকিয়ে আছে। শুধু প্রয়োজন একজন নেতা এবং একটি গর্জন।

দ্বিতীয়ত খ্রিস্টানশক্তি। এ ধর্মাবলম্বীরা সে সময়টায় তাদের সবচেয়ে অসহায় অবস্থা পার করছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকা এবং সভ্যতার অভাবে এরা ছিলো সবদিক থেকে বিপর্যস্ত এবং বিধ্বস্ত। এতকিছুর পরও এরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণ এবং টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মুসলমানদের সঙ্গে

লড়াইয়ের আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকতো, অধীর আগ্রহে কল্পনার রাজ্যে মুসলমানদেরকে তুলোধুনা করতো।

তৃতীয়ত তাতার। এদের না আছে কোনো সভ্যতা, না কোনো ইতিহাস। এদের আবির্ভাব আকস্মিক। না কোনো ধর্ম, না কোনো মতবাদ কিংবা আদর্শ- এ জাতির উদয় হয়েছিলো খুব হঠাৎ করে। ঘূর্ণিঝড়ের মতোই এরা এসে অন্ধকার করে ফেলেছিলো সে সময়ের বিশ্বপরিস্থিতির আকাশ এবং আশেপাশের চারপাশ। সভ্যতা তো দূরের কথা, নিতান্ত ভব্যতা এবং স্বাভাবিক ভদ্রতার কোনো লেশমাত্র তাতারদের রক্তে-মাংসে ছিলো না।

পৃথিবীর এক প্রান্তের খ্রিস্টানশক্তি তাদের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল অপর প্রান্তে তথা ইউরোপ থেকে মঙ্গোলিয়ায় পাঠায়। প্রায় ১২ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এ দলটি তাতারদের দ্বারস্থ হয়। সে সময়ের আব্বাসী খেলাফতকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা তাতারশক্তিকে উস্কে দিতে কোনো চেষ্টা কিংবা প্রলোভন বাদ রাখেনি।

আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস করার জন্য সুদূর বাগদাদ আক্রমণ করার ব্যাপারে ইউরোপীয় প্রতিনিধি দল অশিক্ষিত বর্বর অবিবেচক তাতারদেরকে নানা রকম মিথ্যা ভয় ও আতঙ্ক দেখালো। তারা মুসলমানদেরকে ভয়ঙ্কর জাতি হিসেবে পরিচিত করিয়ে নিজেদেরকে তাতারদের বন্ধু হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখলো। তারা এও জানালো, মুসলিম মানচিত্রের ওপর যেকোনো আক্রমণে ইউরোপের সমর্থন ও শক্তি তাতারদের পাশে থাকবে সবসময়।

এভাবেই তাতারদের মনে মুসলিম সাম্রাজ্য ও খেলাফত সম্পর্কে বিদ্বেষ ও উগ্রতা এবং নির্মমতার প্রাথমিক ক্যানভাস এঁকে দিয়ে গেলো ইউরোপীয় খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের চতুর সদস্যরা। তাতারবাহিনীকে তুলি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলো তারা। এ তুলির আঁচড়েই রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিলো গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর এমন ভয়াবহ অধ্যায় আর আসেনি।

ভাস্কো দা গামা

ভারতবর্ষে ইউরোপের পথপ্রদর্শক

পাঁচশো বছর আগের কথা। তখন আরব বণিকদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছে। কিন্তু তখনও ইউরোপের সঙ্গে ভারতের কোনো যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। সে সময় এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে ব্যবহার করা হতো জলপথ। দুঃসাহসী নাবিকেরা সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আবিষ্কার করতে শুরু করেছিলেন সে পথ। এভাবে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করতে গিয়ে কত লোক যে জীবন দিয়েছে তার হিসাব নেই। কিন্তু যেসব সাহসী নাবিক অভিযানে সফল হয়েছেন তাদের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ইউরোপের লোকেরা প্রাচ্যদেশ ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন ভেনিসের বিখ্যাত বণিক ও পর্যটক মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে। তিনি তেরো শতকের শেষদিকে ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে এসেছিলেন পায়ে হেঁটে। ভারতসহ প্রাচ্য দুনিয়া সম্পর্কে নানা তথ্য ইউরোপ প্রথম পায় তার বিবরণ থেকে। তারপর থেকেই ইউরোপের মানুষ প্রাচ্য তথা ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে থাকে।

তবে তখন ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে আসার কোনো জলপথের সন্ধান ইউরোপবাসীর জানা ছিলো না। প্রাচ্যদেশে ভারত তখন ছিলো এক সমৃদ্ধ উপমহাদেশ। এখানে আসার জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছিলো বহু বছর ধরে। বিশ্বখ্যাত নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাসও ভারতে আসার জলপথ খুঁজতে অভিযাত্রায় বের হয়েছিলেন। ১৪৯২ সালের ৩ আগস্ট তিনি কাঠের তৈরি তিনটি জাহাজ ও ৯০ জন নাবিকসমেত সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিলেন। ভারতের জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা।

ভারতের জলপথ আবিষ্কার করতে ১৪৯৮ সালে একজন তরুণ নাবিক পর্তুগাল থেকে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন অজানার উদ্দেশে। তার নাম ভাস্কো দা গামা। তিনিই প্রথম এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করেন।

১৪৯৭-এর ৯ জুলাই। ভাস্কো দা গামা লিসবন থেকে এক দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় বের হলেন। সঙ্গে ১৭০ জন মাঝিমাল্লা ও চারটি ছোট জাহাজের বহর। এ অভিযাত্রীদলে নেওয়া হয় পর্তুগালের সবচেয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন নাবিককে। এই নৌবহরে ছিলেন তিনজন দোভাষী। তাদের মধ্যে দুজন জানতেন আরবি আর একজন জানতেন বান্টু উপভাষা। আরবি ভাষা জানা দোভাষী নেয়ার কারণ হলো, তখন ভারত অঞ্চলে ব্যবসার ক্ষেত্রে আরব বণিক আর আরবি ভাষার ছিলো বিশেষ প্রাধান্য।

পূর্বসূরী অভিযাত্রীরা যে জলপথ আবিষ্কার করেছিলেন সেই পথ ধরে ভাস্কো দা গামার নৌবহর এগোতে থাকলো দক্ষিণ দিকে। ১৫ জুলাই তারা আফ্রিকা উপকূলের কেনারি দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করলেন। টেনেরিফ দ্বীপ পাশে রেখে তারা কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছালেন ২৬ জুলাই। সেখানে তারা ৩ আগস্ট পর্যন্ত যাত্রা বিরতি করলেন। ৪ আগস্ট আবার যাত্রা শুরু হলো। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে জাহাজের বহর উন্মুক্ত মহাসাগরে পাড়ি দিলো ৬,০০০ মাইলেরও বেশি সমুদ্রপথ। সে সময়ে এটাই ছিলো দিকচিহ্নবিহীন দীর্ঘতম সমুদ্র পাড়ি।

৪ নভেম্বর ১৪৯৭। নাবিকরা আবার ডাঙার দেখা পেলো। এর তিনদিন পর ৭ নভেম্বর জাহাজ এসে পৌঁছলো উত্তমাশা অন্তরীপের প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে সেন্ট হেলেনা উপসাগরে। ২২ নভেম্বর তারা উত্তমাশা অন্তরীপ পার হলেন। এর তিনদিন পর ভাস্কো দা গামা জাহাজ নোঙর করলেন মোসেল উপসাগরে। ৮ ডিসেম্বর আবার যাত্রা শুরু হলো। ২৫ ডিসেম্বরে বড়দিনের উৎসবের দিনটিতে উপকূলের যে জায়গায় জাহাজ নোঙর করা হলো সে জায়গাটার নাম রাখা হলো টেররা নাটালিয়া। ২৫ জানুয়ারি তারা মোজাম্বিকের কাছাকাছি পৌঁছেন।

তারপর ২ মার্চ নৌবহর পৌঁছল মোজাম্বিক দ্বীপে। এখানকার বাসিন্দারা ছিলো মুসলমান। তারা পর্তুগিজদেরও মুসলমান বলে ভাবতো। ভাস্কো দা গামা জানতে পারলেন, এখানকার অধিবাসীরা আরব বণিকদের সঙ্গে

ব্যবসা-বাণিজ্য করে। তারা যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন সেখানকার বন্দরে স্বর্ণ, মণিমুক্তা, রুপো ও মশলার পসরাভর্তি চারটা জাহাজ ছিলো।
১৪ এপ্রিল ১৪৯৪। ভাস্কো দা গামার নৌবহর নোঙর করলো বন্ধুভাবাপন্ন বন্দর মালিন্দিতে। ভাস্কো দা গামা এখানে ভারতীয় বণিকদের দেখা পেলেন। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় ঘটলো আহমেদ বিন মজিদ নামে একজন আরব নাবিকের। কারও কারও মতে, ওই নাবিক ছিলেন গুজরাটি মুসলমান। মৌসুমী বায়ুর গতিবিধি এবং আকাশের তারা দেখে নৌ চালনায় মজিদ ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। তাই তাকে সঙ্গে নিলেন তিনি।
২৪ এপ্রিল ১৪৯৪। শুরু হলো ভারত মহাসাগর পাড়ি দেয়া। একটানা ২৩ দিন জাহাজ চালিয়ে তারা ভারত মহাসাগর অতিক্রম করলেন। দূর থেকে তাদের চোখে ভেসে উঠলো ভারতের ঘাট পর্বতমালা। তারপর তারা এসে পৌঁছালেন ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে। সেখানে ভাস্কো দা গামা আর একটা পেদ্রো স্থাপন করলেন।
১৪৯৮ সালের ২০ মে। ভাস্কো দা গামা তার জাহাজের বহর নোঙর করলেন কালিকট বন্দরে। আরব সাগরের তীরবর্তী দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বন্দর ছিলো এটি। এভাবে আফ্রিকার চারপাশ ঘুরে ইউরোপ থেকে প্রাচ্যে ভাস্কো দা গামার প্রথম অভিযাত্রা শেষ হয়।
১৪৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বরে তিনি লিসবনে সফল অভিযাত্রার আনন্দবার্তা নিয়ে ফিরে আসেন। ইউরোপ থেকে জলপথে ভারতে পৌঁছানোর যে চেষ্টা চলছিলো সুদীর্ঘ ৮০ বছর ধরে তার সফল বাস্তবায়ন ঘটলো। তাই পর্তুগালের রাজা ভাস্কো দা গামাকে বরণ করে নিলেন রাজকীয় সম্মানে। তাকে দোম (লর্ড) উপাধিতে ভূষিত করলেন। উপহার দিলেন প্রচুর ধনসম্পদ। দিলেন সে দেশের বার্ষিক এক হাজার মুদ্রা ভাতা। আর দেশের জনগণের কাছ থেকে ভাস্কো দা গামা পেলেন সাদর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন। তাকে ভূষিত করা হলো 'ভারত মহাসাগরের অ্যাডমিরাল' খেতাবে।
এভাবে এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের নতুন বাণিজ্যপথ আবিষ্কৃত হলো। ২৭,০০০ মাইলের এই সমুদ্রযাত্রা ছিলো বিপদ, নিষ্ঠুরতা এবং শঙ্কায় ভরপুর। এই সাহসী অভিযাত্রায় ভাস্কো দা গামার সময় লেগেছিলো দুই

বছর দুই মাস। এই অভিযানে ১৭০ জন মাঝিমাল্লার মধ্যে বেঁচে ছিলো মাত্র ৫৫ জন।

ভাস্কো দা গামা যে সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন তা দূরত্বের দিক থেকে যথেষ্ট দীর্ঘ হলেও এরপর থেকে ভারতে পর্তুগিজ জাহাজের যাতায়াত শুরু হয়। এর মধ্য দিয়ে ভারতের অঢেল প্রাচুর্যের জগতে ইউরোপের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হলো। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের সঙ্গে পর্তুগালের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তা পর্তুগালের জন্য খুলে দেয় খ্যাতি ও সম্পদ আহরণের পথ। আর ইউরোপের পরবর্তী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও তা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

ভাস্কো দা গামা ১৫০২ সালে ১৫ জাহাজ ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন। একুশ বছর পর ১৫২৪ সালের এপ্রিলে ভাস্কো দা গামা তৃতীয় ও শেষবারের মতো ভারতে আসেন পর্তুগালের ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি হয়ে। এ যাত্রায় তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষে পর্তুগিজ কলোনি বা উপনিবেশগুলির শাসনকর্তা হিসেবে। সে বছরই ২৪ ডিসেম্বর একটি পর্তুগিজ বাণিজ্যকুঠি পরিদর্শন করতে গিয়ে কোচিনে তার মৃত্যু হয়। এই খ্যাতনামা অভিযাত্রীর অবদান ও গৌরবগাথাকে অমর করে রেখেছেন বিখ্যাত পর্তুগিজ কবি লুইশ ভাশ দি কামোইশ তার 'লুসিয়াদস' মহাকাব্যে।

নেলসন ম্যান্ডেলা

কয়েদি নাম্বার ৪৬৬৬৪

পুরো নাম নেলসন রোলিহ্লাহ্লা ম্যান্ডেলা। জন্ম ১৮ জুলাই ১৯১৮। ম্যান্ডেলার বাবা গাদলা হেনরি মপাকানইসা। ম্যান্ডেলার পিতা মপাকানইসার ছিলো চারজন স্ত্রী ও সর্বমোট ১৩টি সন্তান। ম্যান্ডেলার মা ছিলেন মপাকানইসার ৩য় স্ত্রী নোসেকেনি ফ্যানি। নানার বাড়িতেই ম্যান্ডেলার শৈশব কাটে। তার ডাক নাম 'রোলিহ্লাহ্লা'র অর্থ হলো গাছের ডাল ভাঙে যে অর্থাৎ দুষ্ট ছেলে। ম্যান্ডেলা তার পরিবারের প্রথম সদস্য যিনি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। স্কুলে পড়ার সময়ে তার শিক্ষিকা ম দিঙ্গানে তার ইংরেজি নাম রাখেন নেলসন।

এরপর তিনি ক্লার্কবারি বোর্ডিং ইন্সটিটিউটে পড়াশোনা করেন। সেখানে ম্যান্ডেলা ৩ বছরের জায়গায় মাত্র ২ বছরেই জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস করেন। এরপর তিনি ফোর্ট বোফোর্ট শহরের মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হেল্ডটাউন স্কুলে ভর্তি হন। স্কুল থেকে পাস করার পর ম্যান্ডেলা ফোর্ট হেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর অফ আর্টস কোর্সে ভর্তি হন। এখানেই অলিভার টাম্বোর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। টাম্বো আর ম্যান্ডেলা সারাজীবন ধরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষের শেষে ম্যান্ডেলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্র সংসদের ডাকা আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৪৮ এর নির্বাচনে আফ্রিকানারদের দল ন্যাশনাল পার্টি জয়লাভ করে। এই দলটি বর্ণবাদে বিশ্বাসী ছিলো এবং বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করে রাখার পক্ষপাতি ছিলো। ন্যাশনাল পার্টির ক্ষমতায়

আসার প্রেক্ষাপটে ম্যান্ডেলা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ১৯৫২ সালের অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ম্যান্ডেলার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ভাগে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী কর্মীরা আন্দোলনের প্রথম দিকে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের নীতিকে গ্রহণ করে বর্ণবাদের বিরোধিতা করেছিলো।

বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রাম

১৯৬১ সালে ম্যান্ডেলা এএনসির সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন উমখোন্তো উই সিযওয়ে (দেশের বল্লম)-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এই সংগঠনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। ম্যান্ডেলা নিজে তার এই সশস্ত্র আন্দোলনকে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে নিতান্তই শেষ চেষ্টা বলে অভিহিত করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন সফল হবে না বলে তিনি উপলব্ধি করেন এবং এ জন্যই সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেন।

গ্রেফতার ও রিভোনিয়ার মামলা

প্রায় ১৭ মাস ধরে ফেরারি থাকার পর ১৯৬২ সালের ৫ আগস্ট ম্যান্ডেলাকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জোহানেসবার্গের দুর্গে আটক রাখা হয়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ম্যান্ডেলার গতিবিধি ও ছদ্মবেশ সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার নিরাপত্তা পুলিশকে জানিয়ে দেয়, ফলে ম্যান্ডেলা ধরা পড়েন। তিনদিন পরে তাকে ১৯৬১ সালে শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়া এবং বেআইনিভাবে দেশের বাইরে যাবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

কয়েদি নং ৪৬৬৬৪

ম্যান্ডেলার কারাবাস শুরু হয় রবেন দ্বীপের কারাগারে। এখানে তিনি তার ২৭ বছরের কারাবাসের প্রথম ১৮ বছর কাটান। কারাগারে ম্যান্ডেলার কয়েদি নাম্বার ছিল ৪৬৬৬৪। ১৯৬৪ সালের ৪৬৬ নম্বর কয়েদি হওয়ায় এ রকম নম্বর। ম্যান্ডেলার সহযোদ্ধা ওয়াল্টার সিসুলু, আহমেদ কাতরাদা,

গোভান এমবেকি, রেমন্ড এমহলাবা, এলিয়াস মোতসোলেইদি এবং এন্ড্রু এমলানগেনিকে একই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে পাঠানো হয় রোবেন দ্বীপের কারাগারে। কিন্তু ম্যান্ডেলাকে রাখা হয় একটি ৮ বাই ৭ ফুটের একটি সেলে। জেলে থাকার সময়ে বিশ্বজুড়ে তার খ্যাতি বাড়তে থাকে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষ্ণাঙ্গ নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন। সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসেবে রবেন দ্বীপের কারাগারে ম্যান্ডেলা ও তার সহবন্দীরা একটি চুনাপাথরের খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন। কারাগারের অবস্থা ছিলো বেশ শোচনীয়। কারাগারেও বর্ণভেদ প্রথা চালু ছিলো। কৃষ্ণাঙ্গ বন্দীদের সবচেয়ে কম খাবার দেয়া হতো। সাধারণ অপরাধীদের থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের আলাদা রাখা হতো। রাজনৈতিক বন্দীরা সাধারণ অপরাধীদের চাইতেও কম সুযোগ সুবিধা পেতো। তাকে প্রতি ৬ মাসে একটিমাত্র চিঠি দেয়া হতো এবং একজনমাত্র দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেয়া হতো। ম্যান্ডেলাকে লেখা চিঠি কারাগারের সেন্সরকর্মীরা অনেকদিন ধরে আটকে রাখতো। চিঠি ম্যান্ডেলার হাতে দেয়ার আগে তার অনেক জায়গাই কালি দিয়ে অপাঠযোগ্য করে দেয়া হতো। ১৯৬৮ সালে নেলসন ম্যান্ডেলার মা ও ১৯৬৯ সালে তার বড় ছেলে থেম্বি মারা যান। কিন্তু তাদের অন্তে্যষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেয়া হয়নি ম্যান্ডেলাকে। ১৯৮২ সালের এপ্রিলে অবসান হয় তার রোবেন দ্বীপে বন্দী জীবনের। কারাকক্ষের বাজে পরিবেশের কারণে এক পর্যায়ে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন ম্যান্ডেলা।

মুক্তি

১৯৯০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকার তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসসহ অন্যান্য বর্ণবাদবিরোধী সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা দেন, ম্যান্ডেলাকে অচিরেই মুক্তি দেয়া হবে। ভিক্টর ভার্সটার কারাগার থেকে ম্যান্ডেলাকে ১৯৯০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মুক্তি দেয়া হয়। ম্যান্ডেলার কারামুক্তির ঘটনাটি সারা বিশ্বে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

কারামুক্তির পর ম্যান্ডেলা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯০ হতে ১৯৯৪ পর্যন্ত তিনি এই দলের নেতা ছিলেন। এই সময়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ অবসানের লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এই শান্তি আলোচনা ফলপ্রসূ হবার পর ১৯৯৪ সালে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সব বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অবদান রাখার জন্য ম্যান্ডেলা এবং রাষ্ট্রপতি এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ককে ১৯৯৩ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়। বর্ণবাদবিরোধী এই নেতা বিগত কয়েক বছর ধরে নানা ধরনের বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন। অবশেষে ৯৫ বছর বয়সে ৫ ডিসেম্বর জোহানেসবার্গের হাউটন শহরতলির নিজ বাসভবনেই স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

পাদটীকা

২০০৮ এর জুলাই পর্যন্ত ম্যান্ডেলা ও এএনসি কর্মীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা থেকে নিষিদ্ধ ছিলো। কেবল মাত্র নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে তাদের আসার অনুমতি ছিলো। এর কারণ ছিলো ম্যান্ডেলার ষাটের দশকের সশস্ত্র আন্দোলনের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার তদানিন্তন সরকার ম্যান্ডেলা ও এএনসিকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করেছিলো। ২০০৮ এর জুলাইতে এসেই কেবল ম্যান্ডেলাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রণীত সন্ত্রাসবাদীদের তালিকা হতে সরিয়ে নেয়া হয়।

রেসকোর্স থেকে রমনা পার্ক
স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর রাজসাক্ষী

আজকের যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এটির পূর্ব নাম ছিল রমনা রেসকোর্স ময়দান নামে পরিচিত ছিল। এক সময় ঢাকায় অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যদের সামরিক ক্লাব এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতে এটি রমনা রেসকোর্স এবং তারপর রমনা জিমখানা হিসেবে ডাকা হত। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর মাঠটিকে কখনও কখনও ঢাকা রেসকোর্স নামে ডাকা হত এবং প্রতি রবিবার ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। এটি একটি জাতীয় স্মৃতিচিহ্নও বটে। কেননা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণ এখানেই প্রদান করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই উদ্যানেই আত্মসমর্পণ করে।

প্রাথমিক ইতিহাস

তখন পশ্চিমে আজিমপুর, নিউমার্কেট ও ধানমন্ডি, দক্ষিণে বর্তমান সচিবালয় ভবন, কার্জন হল, চানখাঁর পুল ও পূর্বে পুরানা পল্টন, সেগুনবাগিচা ও রাজারবাগ আর উত্তরে সেন্ট্রাল রোড, পরীবাগ ও ইস্কাটন পর্যন্ত এলাকাটি বিস্তৃত ছিল। বৃটিশ এবং পাকিস্তানি শাসনামলে ঢাকার চারটি থানার একটির নামকরণ করা হয়েছিল রমনা। বর্তমানেও ঢাকার ২০টি থানার একটি হচ্ছে রমনা।

রমনার ইতিহাস শুরু হয় ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে যখন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবাহদার ইসলাম খান ঢাকা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ওই সময় ঢাকার উত্তর শহরতলিতে দুটি চমৎকার আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে। সুবাহদার ইসলাম খান চিশতির ভাইয়ের নামানুসারে এর একটির নামকরণ করা হয় মহল্লা চিশতিয়া এবং সুবাহদার ইসলাম খানের একজন

সেনাধ্যক্ষ সুজা খানের নামানুসারে অপর এলাকাটির নামকরণ হয় মহল্লা সুজাতপুর। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর রমনা ধীরে ধীরে তার পুরনো গৌরব হারিয়ে ফেলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে সরকারি কাগজপত্রে রমনার নাম তেমন একটা চোখে পড়ে না। বস্তুত ওই সময় রমনা ছিল একটি জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত এলাকা যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানকোঠা, মন্দির, সমাধি ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

বৃটিশ আমল

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বৃটিশ কালেক্টর মি. ডয়েস ঢাকা নগরীর উন্নয়নকল্পে কতগুলি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই ঢাকা আবার তার পুরনো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করে। ওই সময় কালেক্টর ডয়েস কালী মন্দির ছাড়া অন্যান্য বেশিরভাগ পুরনো স্থাপনা সরিয়ে ফেলেন এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে রমনাকে একটি পরিচ্ছন্ন এলাকার রূপ দেন। পুরনো হাইকোর্ট ভবনের পশ্চিমে বর্তমানে অবস্থিত মসজিদ এবং সমাধিগুলো তিনি অক্ষত রাখেন। পুরো এলাকাটি পরিষ্কার করে তিনি এর নাম দেন রমনা গ্রিন এবং এলাকাটিকে রেসকোর্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য কাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেন।

নাজির হোসেন কিংবদন্তির ঢাকা গ্রন্থে লিখেছেন, 'বৃটিশ আমলে রমনা ময়দানটি ঘোড়দৌড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রতি শনিবার হত ঘোড়দৌড়। এটা ছিল একই সঙ্গে বৃটিশ শাসক ও সর্বস্তরের মানুষের চিত্তবিনোদনের একটি স্থান। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার খ্যাতনামা আলেম মুফতি দীন মহম্মদ এক মাহফিল থেকে ঘৌড়দৌড়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এ কারণে সরকার ১৯৪৯ সালে ঘৌড়দৌড় বন্ধ করে দেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় নেতা হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর নামানুসারে রমনা রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান রাখা হয়। ৭০ দশকের শেষভাগ থেকে শুরু করে এখানে প্রচুর গাছগাছালি রোপণ করা হয়।

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরও রমনা ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবেই থেকে যায়। শাহবাগ থেকে ইডেন বিল্ডিং (সচিবালয়) পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা করা হয় এবং এই রাস্তার পূর্বদিকের অংশে রমনা পার্ক নামে একটি চমৎকার বাগান গড়ে তোলা হয়। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জেল থেকে মুক্তি পেলে রমনা রেসকোর্সে তাকে এক নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া এবং এখানেই তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ রমনা রেসকোর্সে এক মহাসমাবেশের আয়োজন করে এবং এই সমাবেশে জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যগণ প্রকাশ্যভাবে জনসভায় শপথ গ্রহণ করেন যে, কোন অবস্থাতেই এমনকি পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের চাপের মুখেও তারা বাংলার মানুষের স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ আবার এই রমনাতে এক মহাসমাবেশে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই ঘোষণার মাধ্যমে কার্যত দেশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করেন। ৯ মাস বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে এবং রমনা মাঠেই (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এই দিনটি বাংলাদেশের বিজয় দিবস। এই ঘটনার পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বক্তব্য রাখেন। এ সময় থেকে রমনা রেসকোর্স গুরুত্বপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাবেশের স্থানে পরিণত হয়।

উদ্যানের বিভিন্ন স্থাপনা

১৯৭৫ সালের পর এলাকাটিকে সবুজে ঘেরা পার্কে পরিণত করা হয়। পার্কের একপাশে শিশুদের জন্য একটি বিনোদন কেন্দ্র তথা পার্ক গড়ে

তোলা হয়। এখানে শিশুদের জন্য নানা ধরনের আকর্ষণীয় খেলাধুলা, খাবার রেস্তোঁরা এবং ছোটখাট স্মারক জিনিসপত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলিকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে এখানে 'শিখা চিরন্তন' স্থাপন করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে তার পাশেই যেখানে পাকিস্তানি সেনারা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছিল সেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে স্বাধীনতা টাওয়ার। ১৯৯৬ সালে এখানে স্বাধীনতা স্তম্ভ ও শিখা চিরন্তন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। স্বাধীনতা স্তম্ভ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ জনতার দেয়াল নামে ২৭৩ ফুট দীর্ঘ একটি ম্যুরাল বা দেয়ালচিত্র। এটি ইতিহাসভিত্তিক টেরাকোটার পৃথিবীর দীর্ঘতম ম্যুরাল। এর বিষয়বস্তু ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। এছাড়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে খনন করা হয়েছে একটি কৃত্রিম জলাশয় বা লেক। ২০০১ সালে উদ্যানের ভেতর ঢাকা জেলার শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা সংবলিত একটি স্থাপনা তৈরি করা হয়।

সূত্র : *উইকিপিডিয়া*

বাংলা সংবাদপত্রের পুরোধা

মানিক মিয়া ও দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক বাংলাদেশের প্রাচীনতম দৈনিকগুলোর একটি। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩ সালে দৈনিক ইত্তেফাক সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এটি ছিলো সাপ্তাহিক। ইত্তেফাক-এর প্রতিষ্ঠাতা স্মরণীয় বাঙালি ব্যক্তিত্ব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জন্ম ১৯১১ সালে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া গ্রামে। তার বাবার নাম মুসলেম উদ্দিন মিয়া। শৈশবেই মানিক মিয়ার মা মারা যান। গ্রামের পূর্ব ভান্ডারিয়া মডেল প্রাইমারি স্কুলে মানিক মিয়ার শিক্ষাজীবনের শুরু। সেখানে কিছুদিন পড়ার পর তিনি ভর্তি হন ভান্ডারিয়া হাই স্কুলে। স্কুলজীবন থেকেই তার মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন থেকেই তিনি ছিলেন সহচর-সহপাঠীদের কাছে ক্ষুদে নেতা। ভান্ডারিয়া স্কুলে মানিক মিয়া অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তারপর চলে যান পিরোজপুর জেলা সরকারি হাই স্কুলে। সেখান থেকেই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৫ সালে মানিক মিয়া ডিস্টিংশনসহ বরিশাল বিএম কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন।

পড়াশোনা শেষ করে তিনি পিরোজপুর জেলা সিভিল কোর্টে চাকরি শুরু করেন। চাকরি করার সময় তিনি একবার বরিশাল জেলা তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। কোর্টের চাকরিকালীন সময়ে জনৈক মুন্সেফ একদিন তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি যোগ দেন তদানীন্তন বাংলা সরকারের জনসংযোগ বিভাগে বরিশাল জেলার সংযোগ অফিসার হিসেবে।

কিন্তু তার রক্তে মিশে ছিল রাজনীতি আর স্বদেশপ্রেমের টগবগে জোয়ার, তাই তিনি রাজনীতি থেকে বেশিদিন নিজেকে দূরে রাখতে পারলেন না। তিনি কলকাতার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেন। সে সময় রাজনৈতিক প্রচারকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে একটি প্রচারপত্রের প্রয়োজন অনুভব করেন শীর্ষনেতারা এবং সেই চিন্তা থেকেই মানিক মিয়ার উদ্যোগে ১৯৪৬ সালে আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদনায় বের হয় 'দৈনিক ইত্তেহাদ'। মানিক মিয়া ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এর পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেন। এ পত্রিকার সঙ্গে মানিক মিয়া মাত্র দেড় বছরের মত যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমেই তার গণমাধ্যম জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। দেশ বিভাগের পর থেকে পত্রিকাটি ঢাকায় নিয়ে আসার অনেক চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু তিনবার পত্রিকাটিকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশে বাধা দেয়া হয় এবং এখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বারবার এভাবে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ। মানিক মিয়াও তখন ঢাকায় চলে আসেন।

১৯৪৮ সালেই পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে নামে। এই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙালির পাকিস্তান মোহ কিছুটা কাটতে থাকে। ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। একই বছরে এই রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসেবে আবির্ভাব ঘটে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক-এর। আবদুল হামিদ খান ভাসানী পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক সম্পাদকের দায়িত্ব পান এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান এর প্রকাশক হিসেবে থাকেন। তবে তারা দুজনেই সক্রিয় রাজনীতি ও পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে ব্যস্ত থাকায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে সম্পাদক নিয়োগ করেন। ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে মানিক মিয়া এই পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাকে রূপান্তরিত হয়। এ সময়ে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৫৪ এর সাধারণ নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্টের জয়ে

ইত্তেফাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আইয়ুব খান হতে ইয়াহিয়া খান পর্যন্ত সকল সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে। সামরিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ১৯৫৯ সালে তিনি এক বছর জেল খাটেন। ১৯৬৩ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন। এ সময় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনা নিষিদ্ধ এবং নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর ফলে তার প্রতিষ্ঠিত অন্য দুটি পত্রিকা ঢাকা টাইমস ও পূর্বাণী বন্ধ হয়ে যায়। আইয়ুব খান ১৯৬৬ সনের ১৭ জুন হতে ১১ জুলাই এবং এরপর ১৯৬৬ সনের ১৭ জুলাই হতে ১৯৬৯ সনের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এর প্রচারণা বন্ধ রাখেন। গণআন্দোলনের মুখে সরকার ইত্তেফাকের ওপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ফলে ১৯৬৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ইত্তেফাকের 'রাজনৈতিক হালচাল' ও পরবর্তী সময়ে 'মঞ্চে নেপথ্যে' কলামে মোসাফির ছদ্মনামে নিয়মিত উপসম্পাদকীয় লিখতেন। ১৯৬৩ সালে তিনি আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্সটিটিউটের পাকিস্তান শাখার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে কাশ্মিরে সৃষ্ট দাঙ্গা ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে তা প্রতিরোধে স্থাপিত দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির প্রথম সভাপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

মালিকানার হাতবদল

মানিক মিয়া ১৯৬৯ সনের ১ জুন মারা যান এবং তার দুই ছেলে মইনুল হোসেন ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হাতে নেন। পাকিস্তান আর্মি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ইত্তেফাকের অফিস পুড়িয়ে ফেলে এবং পুনরায় এর প্রকাশনা (পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে) শুরু হতে ওই বছরের ২১ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সনের ১৭ জুন ইত্তেফাকের জাতীয়করণ হয়, নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি প্রধান সম্পাদক হন এবং ঢাকার ১ রামকৃষ্ণ মিশনস্থ নিউ নেশন প্রেস হতে প্রকাশিত হতে থাকে।

মানিক মিয়ার ছেলেদেরকে ১৯৭৫ সনের ২৪ আগস্ট মালিকানা ফিরিয়ে দেয়া হয়। দুই ভাই দীর্ঘস্থায়ী বিবাদে জড়িয়ে পড়েন এবং তারা দুজনে পালাক্রমে এই প্রভাবশালী পত্রিকা পরিচালনা করেন। দুই পক্ষের মধ্যে

সংঘর্ষের কারণে কয়েক দফা বন্ধও হয়েছিল ইত্তেফাক। ২০০৭-২০০৮ সনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জরুরি অবস্থা চলাকালে পুরো নিয়ন্ত্রণ নেন ওই সময়ের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেন। ২০১০ সনের ২ মে বিকেলে ঢাকার শেরাটন হোটেলে দুই পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এ চুক্তি সই হয় এবং ছোট ছেলে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও দুই মেয়ে (ও তাদের সন্তানেরা) মালিকানা গ্রহণ করেন। বিনিময়ে বড় ছেলে মইনুল হোসেন ১০ কোটি টাকা ও ইত্তেফাক ভবনের পুরো মালিকানা পান।

মৃত্যু

দীর্ঘ সংগ্রামের পর একটা সময়ে এসে মানিক মিয়া কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তার শরীর ভেঙে পড়ে। এ অবস্থায় ১৯৬৯ সালে ২৬ মে এই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি প্রাতিষ্ঠানিক কাজে রাওয়ালপিন্ডি যান। সেখানেই ১৯৬৯ সালের ১ জুন রাতে তিনি মারা যান।

তথ্যসূত্র : *উইকিপিডিয়া*

সত্যের আলোকমশাল

মুনশি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

মুনশি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। পিতার নাম ওয়ারেছ উদ্দীন। যশোর শহর থেকে মাত্র ৪ মাইল দূরে যশোর-ঢাকা মহাসড়কের ওপর চুড়ামনকাঠি বাজারসংলগ্ন ছাতিয়ানতলা গ্রামে মুন্সী ওয়ারেছ উদ্দীন বাস করতেন। কাছের আরেকটি গ্রাম বারবাজার একটি প্রাচীন স্থান। হজরত খান জাহান আলী রহ.ও এখান থেকেই ইসলাম প্রচারের শুভ সূচনা করেন। এই বারবাজার সংলগ্ন ঘোপ গ্রামে মামার বাড়িতে মুনশি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

মেহেরুল্লাহ মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। এ জন্য তার লেখাপড়া বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। মায়ের কাছে ও নিজের চেষ্টায় তার লেখাপড়া চলতে থাকে। ১৪ বছর বয়সে তিনি শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাড়ি ত্যাগ করে কয়ালখালী গ্রামে যান। সেখানে তিনি মৌলভি মেছবাহ উদ্দীনের কাছে তিন বছর এবং করচিয়া গ্রামের মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের কাছে আরও তিন বছর শিক্ষাগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ওস্তাদদ্বয়ের কাছে আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার কারণে অতি অল্প সময়েই তিনি কুরআন ও হাদিসে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করেন। সাথে সাথে শেখ সা'দীর 'গুলিস্তাঁ', 'বোস্তা' ও 'পান্দেনামা' মুখস্থ করে ফেলেন।

মুনশি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ কর্মজীবনের প্রথমে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান যশোর জেলা বোর্ডে চাকরি পান। কিন্তু স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে কিছুদিন পর তিনি সে চাকরি ছেড়ে দেন এবং স্বাধীনভাবে দর্জির কাজ শুরু করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি কাটিং মাস্টার হিসেবে প্রচার

খ্যাতি অর্জন করেন। যার কারণে তখনকার যশোরের জেলা প্রশাসক তার কাজে খুশি হয়ে তাকে দার্জিলিং নিয়ে যান এবং দোকান করে দেন।
দার্জিলিং যাবার আগে যশোর শহরের কেন্দ্রস্থল দড়াটানা মোড়ে তার দর্জির দোকানে বসে তিনি দেখেছেন মিশনারিদের অপতৎপরতা। এ সময় খ্রিস্টান মিশনারিরা সেবার নামে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ও গরিব মুসলমানদেরকে ধর্মান্তর করছিল। সে সময় ক্ষমতাসীন বৃটিশ সরকারের মদদে খ্রিস্টান প্রচারকগণ প্রকাশ্যে সভা-সমাবেশে আল্লাহ, রাসুল সা. ও কুরআনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করত, নানা কুপ্রশ্ন ছুঁড়ে দিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে খ্রিস্টানদের এহেন অন্যায় কাজের মোকাবেলায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সেদিন কেউ এগিয়ে আসেনি। এসব দেখেশুনে কিশোর মেহেরুল্লাহর মনে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠত কিন্তু খ্রিস্টানদের অপপ্রচারের জবাব দেয়ার মত জ্ঞান-গরিমা না থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করতে পারতেন না।
মুনশি মেহেরুল্লাহ যখন দার্জিলিং অবস্থান করছিলেন তখন তিনি বাইবেল, বেদ, গীতা, উপনিষক, ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব ইত্যাদি ধর্মীয়গ্রন্থ গভীরভাবে পড়ার সুযোগ পান। বিশেষ করে এ সময় তোফাজ্জল মুকতাদী নামক একটি উর্দু গ্রন্থ পড়ে বিভিন্ন ধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে জানতে পারেন। এরপর হজরত সোলায়মান ওয়াসির লেখা 'কেন আমি আমার পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম', 'প্রকৃত সত্য কোথায়' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠেও তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।
মেহেরুল্লাহ দার্জিলিং থেকে তল্পিতল্পাসহ ফিরে এলেন যশোর। আবারো দড়াটানায় দেখা গেল তাকে। তবে দর্জি হিসেবে নয়, তুখোড় বক্তা হিসেবে। এরপরই তিনি খ্রিস্টানদের অপপ্রচারের দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার জন্য ছুটলেন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের অলিতে গলিতে। বক্তৃতা করতে লাগলেন, আরও বেগবান করার জন্য কলকাতার নাখোদা মসজিদে প্রখ্যাত মনীষী ও ইসলাম প্রচারক মুন্সী শেখ আবদুর রহীম, মুন্সী রিয়াজুদ্দীন আহমদের মত ব্যক্তিত্বদের সাথে বসলেন। ওই বৈঠকেই গঠিত হয় 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি'। সমিতির পক্ষ থেকে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর ওপর দায়িত্ব দেয়া হয় বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের।

মুনশি মেহেরুল্লাহর আকর্ষণীয় ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় মানুষ এতই আমোদিত হল যে, দলে দলে অমুসলিমরা মুসলমান হতে লাগল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ তার সভা-সমাবেশে উপস্থিত হত। এ সময় তিনি সারা উপমহাদেশে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন যে, তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তিনি যে শুধু অসাধারণ বক্তাই ছিলেন না, তার কলমের ধার ছিল দু'ধারী খোলা তলোয়ারের মত। তিনি খ্রিস্টান লেখক জন জমিরুদ্দীনের নানা ঔদ্ধত্যপূর্ণ লেখার যুক্তিপূর্ণ লিখিত উত্তর দেন। যা সেই সময়কার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি জাতির কল্যাণের জন্য দশটার মত গ্রন্থ রচনা করেন। যা তার জীবিত অবস্থায় বহুবার প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন, 'যদিও আমি ভালো বাংলা জানি না তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।'

তার লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– খ্রিষ্টীয় ধর্মের অসারতা, মেহেরুল এছলাম, রদ্দে খ্রিষ্টান ও দলিলোল এছলাম, জওয়াবোন্নাছারা, বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদভাণ্ডার, হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, পন্দোনামা, শ্লোকমালা, খ্রিষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ, মানবজীবনের কর্তব্য ইত্যাদি।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর উৎসাহ উদ্দীপনায় বাংলা ও আসামে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তিনি তার প্রত্যেকটি আলোচনায় শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতেন। ১৯০১ সালে নিজ গ্রামের পাশের গ্রাম মনোহরপুরে 'মাদরাসায়ে কারামাতিয়া' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি বর্তমানে 'কর্মবীর মুন্‌শী মহেরুল্লাহ একাডেমী' নামে পরিচিত।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য আমরা ১৯৫২ সালে জীবন দিলেও ভাষা আন্দোলন তার বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়। সে সময়েও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অনেকেরই অনীহা ছিল। এ জন্য মেহেরুল্লাহ লিখেছেন, 'মাতৃভাষা বাংলা লেখাপড়ায় এত ঘৃণা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমানজনক মনে করেন।'

সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যারা তার উৎসাহ উদ্দীপনায় খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তারা হলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কবি গোলাম হোসেন শেখ, হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, মুনশি শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ। সিরাজীর অনল প্রবাহ কাব্য মুনশি মেহেরুল্লাহই প্রথম প্রকাশ করেন।

মুনশি মেহেরুল্লাহ শেষ জীবনে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) মনোনীত হন। পরের বছর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি সমাবেশে একাধারে বক্তব্য রাখার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজবাড়ি ছাতিয়ানতলায় চলে আসেন। চিকিৎসাও চলতে থাকে। কিন্তু কয়েকদিন পর ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ সবাইকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মুনশি মেহেরুল্লাহর নিজ বাড়ি ছিল যশোর জেলার ছাতিয়ানতলা গ্রামে। স্থানটি বর্তমান যশোর ঝিনাইদা প্রাচীন রেলরাস্তার পাশে (পাঁচ ছয় মাইলের কাছে) চুড়ামনকাঠি নামক রেলস্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তান আমলে স্টেশনটির নামকরণ করা হয় মেহেরুল্লাহ নগর।

নাসির হেলালের প্রবন্ধ অবলম্বনে

বাংলার অবিস্মরণ

ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস

১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং পূর্ববাংলার ৮০ শতাংশ মানুষ ছিলো ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কিন্তু মুসলমান হলেও তাদের ভাষা ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। দেখা যায়, পূর্ববাংলা প্রায় একটি একক জনগোষ্ঠীর অঞ্চল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান একটি বহু ভাষাভিত্তিক অঞ্চল। পূর্ববাংলায় বাংলা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের ভাষাভাষী মানুষের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। ঠিক তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো প্রদেশে বাংলাভাষী মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের ভাষার এই পার্থক্য যেকোনো একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গড়ে তোলা ছিলো অসম্ভব। কোনো একটি ভাষা উভয় অংশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না।

বাঙালির মাতৃভাষা যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলো প্রায় অপরিচিত; তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান ভাষা যেমন পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, বেলুচ পূর্ববাংলায় ছিল অপরিচিত। অবশ্য উর্দু পূর্ববাংলার কিছু লোক বলতো। তারা বিহার থেকে আসা উদ্বাস্তু এবং নবাব ও অভিজাত শ্রেণীর কিছু মানুষ। শুধু তাই নয়, তাদের লিপির পার্থক্য কোনো একটি ভাষাকে অপর অংশে প্রচলন করা কঠিন করে তুলেছিলো।

বাঙালিরা তাদের ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে। উনিশ শতকীয় ভারতবর্ষের নবজাগরণের সূচনা এ বাংলা থেকেই। বাংলাভাষা ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা, যে ভাষায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান এবং বাংলাভাষাকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করেন। বিশ্বকবির মাধ্যমে বাংলাভাষা বিশ্বভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। তাই বাঙালি তার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ক্রমেই গর্বিত হয়ে উঠতে থাকে।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১৭ জুলাই হায়দরাবাদ মুসলিম লীগনেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান এবং একই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পাকিস্তানি মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর ঘোষণা দেওয়ার আগেই উর্দুর পক্ষে বক্তব্য দিতে শুরু করেন মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতারা এবং বাংলাকে হিন্দুদের ভাষা বলে তা মুসলমানদের জন্য পরিত্যাজ্য- এমন বক্তব্য প্রকাশ করতে থাকে প্রতিক্রিয়াশলী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। ইতিহাস প্রমাণ করে, পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই ভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। দেশভাগের আগে সে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল কেবল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। ১৯৪৮ সালের ১৮ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জিন্নাহর ঘোষণা সে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে, রাজনৈতিক রং ছড়ায়।

বাংলাভাষার পক্ষেও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ লেখালেখি শুরু করে। সম্ভবত ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বাংলার পক্ষে প্রথম কলমযুদ্ধ শুরু করেন। ড. জিয়াউদ্দীন আহমদের ওই সুপারিশের অসারতা সম্পর্কে পূর্ববাংলার মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশে ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে নানা যুক্তি তুলে ধরেন এবং শেষে বলেন, 'বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দি ভাষা গ্রহণ করা হলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হবে। ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার স্বপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতিবিরোধী নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।'

মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলা নতুন করে আরেক পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানপন্থীদের উর্দুর পক্ষাবলম্বনের বিরুদ্ধে প্রথম যুগে

যারা বাংলাভাষার পক্ষে কলম তুলে নেন, তাদের পথিকৃৎ হলেন প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক আবদুল হক।

১৯৪৭ সালের জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন ছদ্মনামে চারটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি সরকারি চাকরি করতেন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার পেছনে লেগে যায়।

পাকিস্তানের বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান ১৯৪৯ সালে আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার জোর প্রচার চালান। প্রতিবাদে আবদুল হক লেখেন– 'আরবি হরফে বাংলা।' (দৈনিক ইত্তেহাদ ও রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগ, ২০ মার্চ, ১৯৪৯)

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান 'মুসলমান বাঙালি'তে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। তাই অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' বলে অভিহিত করা হয়েছিলো। মওলানা আজাদ বলেছিলেন, পাকিস্তান না পাওয়া পর্যন্ত কোনো যুক্তি মুসলমানদের কানে ঢুকবে না। ঠিক তা-ই হয়েছে।

বৃটিশের অত্যাচার-নির্যাতন ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ একটি ভারতীয় জাতি গঠনে সহায়ক হয়েছিল। তেমনি পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায় এবং মুসলমান বাঙালি দ্রুত 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' পরিত্যাগ করে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদে' বিশ্বাস স্থাপন করে। একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়। অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনার বিষয়টি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠতে থাকে এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটে। ওই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের ভরাডুবি প্রমাণ করে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র সাত বছরের মাথায় বাঙালি মুসলমানের মোহ অনেকটাই কেটে গেছে।

তথ্যসূত্র : *ইন্টারনেট*

লাইব্রেরি অব আলেকজান্দ্রিয়া
জ্ঞানের ইতিহাসের পতন

আলেকজান্দ্রিয়া মিসরের অন্যতম বন্দর নগরী। বর্তমানের মতো অতীতেও এই নগরী ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। আলেকজান্দ্রিয়া শহরের নামকরণ করা হয়েছে সম্রাট আলেজান্ডারের নামানুসারে। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাকে এখানেই সমাহিত করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়া নগরীটি প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর এই নগরীর অধিকর্তা হন তলেমি।

তলেমির শাসনামলেই আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রচীনকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ও লাইব্রেরিকে। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য পণ্ডিতদের পদচারণায় মুখরিত থাকত এই লাইব্রেরি। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ১০০ বছর পর সেরাপিয়ার মন্দিরকে কেন্দ্র করে আরেকটি ছোট লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। একে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির ডটার লাইব্রেরি বলা হয়। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে প্রচুর পরিমাণে প্যাপিরাসের স্ক্রৌল সংরক্ষিত ছিল, যার মধ্যে গণিত, ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, ব্যাকরণ, চিকিৎসাবিদ্যার স্ক্রৌল ছিল বেশি।

লাইব্রেরির ইতিহাস

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিটি রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিসরের শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই লাইব্রেরিটি বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। সে সময় একদল পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন যারা আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অধ্যায়ন ও দেখাশোনা করতেন। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিটি তলেমির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এই

লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠায় যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন দিমিত্রাস ফেলিরোন। ফেলিরোন ছিলেন অ্যারিস্টেটলের ছাত্র।

বই সংগ্রহের পদ্ধতি

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বই সংগ্রহ করে তা অনুবাদ করে প্যাপিরাসের স্ক্রোলে লিখে রাখত এবং সংরক্ষণ করত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বই সংগ্রহের জন্য লাইব্রেরিটির আলাদা লোকবল ছিল। একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তারা অ্যাথেন্স ও রোডেসের বইমেলা থেকেও বই সংগ্রহ করতো।

বই সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায় গ্যালেনের বর্ণনা থেকে। গ্যালেন তার বর্ণনায় বলেছেন, আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে নোঙ্গর করা কোনো জাহাজে যদি কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তবে তা জোরপূর্বক হলেও লাইব্রেরিতে নিয়ে আসা হতো। এখানে তারা পাণ্ডুলিপিটির একটি অনুলিপি তৈরি করতো এবং মূল পাণ্ডুলিপিটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হতো এবং অনুলিপিটি মালিককে ফিরিয়ে দিতো।

এছাড়াও তলেমি পরিবারের অনেকেই পর্যটক ছিলন। তাদের হাত ধরে এসেছে অনেক বই। আবার এই লাইব্রেরিতে অনেক পণ্ডিত আসতেন বিদেশ থেকে। তাদের হাত ধরেও এসেছে কিছু বই। আবার অনেক সময় দেশি-বিদেশি পণ্ডিতগণ এখানে গবেষণা করতেন এবং তারা যে বইগুলো লিখেন সেগুলোও এখানে সংরক্ষণ করা হতো।

সংগৃহীত স্ক্রোলের সংখ্যা

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে ঠিক কতগুলো স্ক্রোল ছিল সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। যেহেতু সে সময় বইগুলো প্যাপিরাসের স্ক্রোলে লিখে রাখা হতো তাই একটি বই বা বিষয়কে লিখে রাখার জন্য একাধিক স্ক্রোল ব্যবহার করা হতো। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন এখানে প্রায় ৬,০০,০০০ স্ক্রোল ছিল। তবে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন এখানে ৫,০০,০০০ স্ক্রোল ছিল। সেরাপিয়ার ডটার লাইব্রেরিতে প্রায় ৪০,০০০ স্ক্রোল ছিলো বলে ধারণা করা হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির ধ্বংস

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিটি কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল সে সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। যে তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যেও বির্তক রয়েছে। এই বির্তকের মধ্যেও আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের পিছনে তিনজন ব্যক্তিকে দায়ী করা হয়। এরা হলেন জুলিয়াস সিজার, বিশপ থিওফিলাস ও খলিফা ওমর রা.।

গৃহযুদ্ধ

লাইব্রেরি ধ্বংসের প্রথম ঘটনাটি ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৮৯-৮৮ অব্দে। এই সময়ে তলেমি অষ্টম আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তার সময়ে দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং দেশ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। গৃহযুদ্ধ চলাকালে লাইব্রেরির কিছু অংশে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ সময় অনেক পণ্ডিত প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদ স্থানে চলে যান। আবার কথিত আছে, তলেমি অষ্টম অনেক বিদেশি পণ্ডিতদের লাইব্রেরি থেকে বের করে দেন।

জুলিয়াস সিজারের আক্রমণ

পরবর্তী অগ্নিসংযোগ হয় রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের সময় খ্রিস্টপূর্ব ৪৭ অব্দে। এই সময় রোমান সেনাবাহিনী মিসর জয় করে। মিসর ও রোমের এই যুদ্ধে অংশ হিসেবে সিজার আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই অগ্নিসংযোগে প্রায় ৪০,০০০ স্ক্রোল আগুনে ভস্মীভূত হয় এবং এ লাইব্রেরির অনেক স্ক্রোল রোমান সেনাবাহিনী লুট করে রোমে নিয়ে যায়। এ কারণে হয়তো অনেকেই আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসকারী হিসেবে সিজারের নামই উচ্চারণ করে।

অ্যারেলিয়ানের বিদ্রোহ দমন

পরবর্তী অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে প্রায় ৩০০ বছর পর ২৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় পলিমারের রানী জেনেবিয়া সম্রাট অ্যারেলিয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ দমন করতে যেয়ে অ্যালেরিয়ান ও জেনেবিয়ার মাঝে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অ্যারেলিয়ান লাইব্রেরিটির যে অংশ অক্ষত ছিল সেখানেও অগ্নিসংযোগ

করেন। ফলে লাইব্রেরিটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় বলে ধারণা করা হয়। তবে এই সময় সেরাপিয়ার ডটার লাইব্রেরিটি অক্ষত থাকে।

বিশপ থিওফেলাসের প্যাগান দমন

পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে খৃস্টান ধর্মের আধিপত্য লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলে খৃস্টান ধর্মের আধিপত্য বিস্তারে প্রথম ও প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্যাগান মন্দিরগুলো। এই সময় প্যাগান মন্দিরগুলোতেও বিভিন্ন ধরনের স্ক্রৌল সংরক্ষণ করা হতো। এই স্ক্রৌলগুলোর অধিকাংশই ছিল প্যাগান ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে বিশপ থিওফেলাস প্যাগানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তিনি প্যাগান মন্দির বন্ধের নির্দেশ দেন। প্যাগানরা তাতে অস্বীকৃতি জানালে থিওফেলাস তাদের সকল মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে। এই সময় সেরাপিয়ার ডটার লাইব্রেরিটিও ধ্বংস হয়। কারণ সেরাপিয়ার ডটার লাইব্রেরিটি ছিল একটি প্যাগান মন্দিরের অভ্যন্তরে। এই প্যাগান মন্দিরগুলো ধ্বংসের মাধ্যমেই খৃস্টানরা প্যাগানদের বিরুদ্ধে জয়ী হয় এবং হারিয়ে যায় অমূল্য প্যাপিরাসের স্ক্রৌল।

ওমর রা.-এর মিসর বিজয়

সর্বশেষ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় খলিফা ওমর রা. মিসর জয় করেন। মিসর জয়ের পর তার সৈনিকগণ তাকে জিজ্ঞেস করেন– লাইব্রেরির স্ক্রৌলগুলোর কী হবে। এ সময় ওমর রা. উত্তর দেন, যদি স্ক্রৌলগুলো কুরআনকে সমর্থন করে তবে তা রেখে দাও আর যদি না করে তবে তার দরকার নেই, ধ্বংস করে ফেলো। বলা হয়ে থাকে যে, সৈনিকদের গোসলের পানি গরম করার জন্য প্যাপিরাসের স্ক্রৌলগুলোকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিলো এবং এই স্ক্রৌলগুলো দিয়ে প্রায় ৬ মাস পানি গরম করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র : *ইন্টারনেট*

ইতিহাসের নীরব মহানায়ক

শহিদ নুরালদীন রহ.

উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ব্যাপক দীর্ঘ ও বিস্তৃত। এ মাটির রয়েছে স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের উজ্জ্বল গৌরবগাথা। জাতির অস্তিত্বে মিশে আছে হাজারো বীর শহিদদের তাজা রক্ত। দেশ ও জাতির অস্তিত্বের প্রয়োজনে বারবার হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে স্বাধীনতাকামী জনগণ। ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে লড়েছে বৃহৎশক্তির বিরুদ্ধে। টিকতে দেয়নি কোনো পরাশক্তিকে। কোনো জালেম যদিও কূটকৌশলে কিছুদিন ক্ষমতায় থাকতে পেরেছে, তবু তাদের রাজত্ব বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি। অন্তত ভারতবর্ষের ইতিহাস এমনটিই সাক্ষ্য দেয়।

মোঘল সম্রাটের নৈতিক অধঃপতন ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সুযোগে ব্যবসার ছলনায় উপমহাদেশে প্রবেশ করে ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী। পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় অবিভক্ত ভারতে সাম্রাজ্য গড়ে তুলে মানবতার শত্রু ইংরেজরা। শুরু করে তাদের প্রভুত্ব। নির্যাতনের স্ট্রিমরোলার চালায় সর্বশ্রেণির মানুষের উপর। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বেশেষে কেউ রক্ষা পায়নি তাদের অমানুষিক আচরণ থেকে।

সাম্রাজ্য বিস্তার ও তা সুসংহত করতে গিয়ে তারা এমন নির্যাতন চালিয়েছে, যা শুনলে মানবতা গুমরে উঠে। থমকে দাঁড়ায় মনুষ্যত্ব। বর্তমানে ইতিহাসের পাতায় ইংরেজদের অত্যাচারের যেসব ঘটনা পাওয়া যায়, সেগুলো তাদের কুকীর্তির ধারণা মাত্র। এমন অনেক ঘটনা আজও অধরায় রয়ে গেছে, যা কখনো উঠে আসেনি ইতিহাসের পাতায়। অথবা সরিয়ে রাখা হয়েছে।

এর মূল কারণ হলো, ইংরেজদের আমরা বিতাড়িত করলেও বিতাড়িত করতে পারিনি তাদের প্রেতাত্মাগুলো। আজও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা,

রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিচারিক নিয়মকানুন ও সাহিত্য সংস্কৃতি চলছে তাদের রেখে যাওয়া পরিত্যক্ত নিয়ম কানুনে।

ইংরেজ আগমনের ফলে এই দেশের মানুষের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় আরো কয়েকগুনে। জমিদারদের অন্যান্য খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে ভিটেহারা হয় হাজারো কৃষক। লাঠিয়াল বাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারাতে হয় অগণিত মা-বোনের। তবুও দু'মুঠো ভাতের জন্য হাজারো অভিমান বুকে চেপে নিরবে অত্যাচার সয়ে যেতো কৃষকরা।

কিন্তু এভাবে কতোদিন? কতো সহ্য করবে তারা এসব জুলুম-নির্যাতন? ক্ষোভের দানা বাঁধতে শুরু করে কৃষকদের মনের কোণে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভুত ক্ষোভ একসময় রূপ নেয় কৃষকবিদ্রোহে।

এরকম বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকবার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিলো, যেগুলো ইংরেজদের ক্ষমতার ভিতকে দুর্বল করে তোলে অনেকাংশে। মূলত সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকদের এসব বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহগুলোই বড় বড় যুদ্ধ ও বিদ্রোহ গড়ে উঠতে সহায়তা করে। এ লেখায় আমাদের আলোচনা এমনই এক মহান ব্যক্তিকে নিয়ে, যার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিলো ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহ।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালে। তিতুমীরের বাশেরকেল্লার বিদ্রোহের সময়কাল ১৮৩০ পরবর্তী। অনেক আলোচিত নীল বিদ্রোহগুলোও সংঘটিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে মধ্যভাগে ।

কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের প্রায় আশি বছর আগে ব্যাপক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে পূর্ববাংলার রংপুর ও আশেপাশের অঞ্চলে। এই বিদ্রোহের নায়ক কৃষক নুরালদীন। পূর্ববাংলার অন্যতম প্রথম কৃষক বিদ্রোহী বলে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন।

বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত করে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস দেবী সিং নামক এক অত্যাচারী লোভী ব্যক্তিকে রংপুর অঞ্চলের জায়গিরদার নিয়োগ করেন। দেবী সিং ইজারা পাওয়ার পর বেশি রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার করেন। অতিরিক্ত কর

প্রদানে ব্যর্থ হয়ে দেবী চৌধুরানীসহ বহু জমিদার তাদের সম্পদ ও জমিদারি হারান। আর কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে পড়েন। খাজনা দিতে না পারায় দলে দলে কৃষকদের জেলে পাঠানো হয়। সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কৃষকদের ধরে এনে পিঠে চাবুকের কষাঘাত করা হয় ও কুড়েঘর আগুনে পুড়ে ছাই করা হয়।

এ সময় অনেকে মহাজনের দ্বারস্থ হয়। অনেকে বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। নারীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালানো হয় এবং অনেককে জেলে পাঠানো হয়। কৃষককুল তাদের লাঙ্গল, বলদ, বাড়ি-ঘর সবই হারায়।

এই নির্মম ও পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য ১৭৮২ খৃস্টাব্দে রংপুর অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়ে ওঠে। কৃষকরা প্রথমে দেবী সিংহের অত্যাচার বন্ধ ও অন্যান্য দাবি পূরণের জন্য রংপুর কালেক্টর গুডল্যান্ডের কাছে দাবি জানায়। গুডল্যান্ড দাবি না মানায় এ অঞ্চলের নিপীড়িত মানুষ নুরালদীন নামক এক সংগ্রামী ও সাহসী কৃষককে নবাব হিসেবে ঘোষণা দিয়ে খাজনা দেবে না, এমনকি ইংরেজ শাসন মানবে না মর্মে ঘোষণা দেয়। কৃষকের নবাব নুরালদীন এক ফরমান জারি করে দেবী সিংহকে খাজনা দিতে বারণ করেন।

১৭৮৩ সালের রংপুরের এই কৃষক বিদ্রোহ পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রামসহ সমগ্র এলাকায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের হাতে ডিমলার জমিদার নিহত হন। দেবী সিংহ ও গুডল্যান্ড সেনাপতি ম্যাকডোল্যান্ড-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রেরণ করেন। এই বাহিনী পথে পথে বিদ্রোহীদের বাধার সম্মুখীন হয় এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

নুরালদীনের বাহিনী ইংরেজ সৈন্যদের ঘাঁটি মোগলহাট আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে অদম্য সাহসী কৃষকের নবাব নুরালদীন আহত অবস্থায় বন্দি হন এবং ইংরেজরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

এরপর দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, কৃপানাথ, অনুক নারায়ণ, শিবচন্দ্র রায়, চেরাগ আলী, শ্রী নিবাস প্রমুখ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী পায়রাডাঙ্গা মঠ ও মন্দির স্থাপন করে সন্ন্যাসীবেশে

আশ্রয় নিয়ে দিনের বেলা পূজা অর্চনা করতেন আর রাতের আঁধারে বেনিয়া ইংরেজদের উপর আক্রমণ চালাতেন।

এই মঠ মন্দিরের সন্ন্যাসীগণ ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু যোগী। এই সন্ন্যাসীগণ ত্রিশূল ব্যবহার করতেন। একটি সূত্র মতে, বিদ্রোহীরা হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মধ্যে ইংরেজ হটাও মন্ত্রের এক অপূর্ব সেতুবন্ধন রচনা করেন। এই বাহিনীর যোদ্ধারা ছিলেন মোগল সম্রাজ্যের বেকার সৈন্য ও বাংলার ভূমিহীন নিপীড়িত কৃষক।

প্রতিটি যুদ্ধ ও বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা হয়। সব যুদ্ধের নায়কদের গৌরবগাথার ইতিহাসও রচনা হয়। কিন্তু এমন অনেক মহানায়কই রয়ে যান ইতিহাসের আড়ালে। নুরালদীন পরাক্রমশালী বৃটিশদের সামনে বেশিদিন টিকতে পারেননি সত্য, কিন্তু নুরালদীন যে বিদ্রোহের বীজ বপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন এই বাংলার বুকে, তারই ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ হয়ে সর্বভারতীয় সিপাহি বিদ্রোহে রূপ নিয়েছিলো একশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে।

অদম্য সাহসের নগর
অজেয় শহর কনস্টান্টিনোপল

আজকে আমাদের আলোচ্যবিষয় কনস্টান্টিনোপল। আমরা এখন কনস্টান্টিনোপল বিজয় নিয়েই কথা বলবো। যেহেতু বিজয়, সেহেতু বিরত্বগাথার ইতিহাস। আমরা সুলতান ফাতেহ মুহাম্মদকে সালাম বলবো। যিনি সুলতান ফাতেহ মুহাম্মদ দ্বিতীয় হিসেবেই বিশেষ পরিচিত। আচ্ছা, কনস্টান্টিনোপল। এটি বর্তমানের ইস্তাম্বুল। তুরস্কের একটি শহর। আমরা জানি, তুরস্কের কতক মাটি ইউরোপ সীমান্তের অধীন। ইস্ত াম্বুল সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমি। আর তাছাড়া এই শহরটির উপর বারংবার নেমে এসেছে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতার চোখ। অনেকেই অধিকার করতে চেয়েছে কনস্টান্টিনোপল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, খুব বেশি আমরা অন্য শাসনের চিহ্ন আমরা কনস্টান্টিনোপলের গায়ে পাই না।

তবে, সবিশেষ একটা সময়ে তথা এগারো শতাব্দীর পর আমরা কনস্টান্টিনোপলের ইতিহাসে সেই বিভিন্ন শাসনের স্বাক্ষর পাই। আমরা মাত্র বলেছি, ইস্তাম্বুল বা কনস্টান্টিনোপল ইউরোপ-সীমান্তের অধীন। কথাটা বুঝতে হবে।

আমরা হয়তো জানি, রোমান শাসনের অধীন একটা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ছিলো। হ্যাঁ, এই সাম্রাজ্যের কথাই আমরা বলছি। সাম্রাজ্যটি কনস্টান্টিনোপলকে ঘিরে গড়ে উঠেছিলো। রোমান সম্রাট কন্টেস্টাইন ৩৩০ খৃস্ট সনে এই কনস্টান্টিনোপলে শাসন আরম্ভ করেন। এরপর থেকে বহু জাতির চোখ এই কনস্টান্টিনোপলের উপর পতিত হয়। কিন্তু রোমান শাসনের বিপরীতে তারা বিশেষ টেকেনি। শেষ পর্যন্ত চতুর্থতম ক্রুসেডের সময় এই মাটি রোমানমুক্ত হয়।

ক্রুসেডাররা এটাকে একটা ল্যাটিন সাম্রাজ্যের রূপ দেয়। যা ছিলো খুবই অস্থায়ী। ফলতঃ বেশ কিছু গ্রিক দেশ বিভক্ত হয়ে পড়ে। নাইসিয়া, লেজনড্রে, এপিরাস ইত্যাদি। আর কিছুদিন গেলে নাইসিয়ানরা এই কনস্টান্টিনোপলের ক্ষমতা তুলে নেয়। এখানে শান্তি ছিলো খুবই অল্প। দেখতে দেখতে সার্বিয়ান, বুলগেরীয় আর তুর্কীয় উসমানিরা হামলা চালায়।

আরও কিছুদিন পরে ব্ল্যাক ডেথ নামক এক মহামারি ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত কনস্টান্টিনোপল শহরে। এই মহামারি শহরের অর্ধেক লোকের প্রাণ কেড়ে নেয়। ফলে, কনস্টান্টিনোপল একটা ভূতুড়ে নগরে পরিণত হয়।

১৪৫০ সালের পর থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায় তুরস্কের মাটিতে। সুলতান ফাতেহ তখন মাত্রই ক্ষমতায় এসেছেন! সুলতান ফাতেহ মুহাম্মদের বিশেভাবে কনস্টান্টিনোপলের দিকে নজর দেয়ার কারণ আছে। এই কনস্টান্টিনোপল এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপের শামিল ছিলো। তিনটি মহাদেশের সদর দরজা বলা যেতে পারে। এতে বাণিজ্যিক আধিপত্য আদায় করতে গেলে এর দখল অত্যাবশ্যক ছিলো। অনেক আগ থেকেই অনেক সুলতান চেষ্টা করে আসছিলেন।

তবে ফাতেহ মুহাম্মদ যেহেতু অন্যদের চাইতে অনেকাংশ এগিয়ে, তাই তিনি কনস্টান্টিনোপল বিহিতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। বলাই বাহুল্য, তুরস্কের উসমানি খেলাফতের জয়জয়কার তখন সর্বত্র। বলকান রাষ্ট্রসমূহ ধীরে ধীরে তুরস্কের অধীন হচ্ছিলো। আর ইউরোপও তাদের করতলগত হচ্ছিলো। এমতাবস্থায় এই কনস্টান্টিনোপল বাইজেন্টাইনদের দখলে থাকলে তুর্কিয়দের জন্য বিপদ হতে পারে। সুতরাং এই কনস্টান্টিনোপলএর একটা রফা চেয়েছিলেন সুলতান। আর বলকান শক্তিগুলো সময়ে সময়ে তুরস্কের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু কখনোই তারা চুক্তি অক্ষুণ্ন রাখেনি। বরং প্রতিবার এই কনস্টান্টিনোপলককে তারা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। এছাড়া কনস্টান্টিনোপল-সম্রাট সবসময় মুসলিমদের সাথে বড় ধূর্তামি করে আসছিলো। এখন কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে সম্রাটকে শিক্ষা দেওয়াও একটা উদ্দেশ্য ছিলো সুলতান ফাতেহ মুহাম্মদের।

আমরা এবার বিজয়ের অদ্ভুত কার্যকরণ নিয়ে আলোচনা করবো! কনস্টান্টিনোপল বিজয় মূলত নৌযুদ্ধের উপর দিয়ে।
ইউরোপ কনস্টান্টিনোপলক সাহায্য করে আসছিলো। এই সাহায্য আসতো বসফরাস প্রণালির মাঝ দিয়ে। এই সাহায্য বন্ধ করার জন্য অতীত এক সুলতান প্রতিরোধ-দুর্গ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ফাতেহ মুহাম্মদ আরেকটি দুর্গের প্রয়োজন অনুধাবন করলেন এবং তিনি পুরনো দুর্গের বিপরীতে আরেকটি দুর্গ তৈরি করেন। ফলে কোনো জাহাজ আসতে চাইলেই দ্বিমুখী তোপের সামনে পড়ে যেতো। এরপর সুলতান নৌবহর নিয়ে আগান।
কিন্তু কনস্টান্টিনোপল জয় করা মোট্রে সহজকর্ম ছিলো না। শহরটি তিনপাশেই সমুদ্র এবং সেই সমুদ্রের মাঝে লোহার শেকল টানিয়ে রাখা হয়েছিলো যাতে কোনো জাহাজ সামনে এগুতে না পারে। সমুদ্রে সুলতানও লোহার জাল ও শেকলের বাধার সম্মুখীন হন। এখন সামনে খোলা স্থলভাগ। সুলতান এবার বিরাট সাহসী পদক্ষেপ নেন। দশ মাইল রাস্তা পুরোটা তিনি তক্তা বিছিয়ে তার উপর চর্বি ঢেলে দেন। সৈন্যদের জাহাজ থেকে নেমে সেই কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে টেনে নিতে বলেন সবগুলো যুদ্ধজাহাজ। ব্যাস জাহাজ স্থলভাগ দিয়ে চলতে থাকে। এক রাতের মধ্যেই তিনি পৌঁছে যান কনস্টান্টিনোপল শহরের উপকণ্ঠে।
সুলতান প্রায় এক সপ্তাহ গোলাবর্ষণ করেন কনস্টান্টিনোপল শহরের উপর। তারপর ১৪৫৩ সালের ২৩ মে রাজাকে সমর্পণের আহ্বান করেন। কনস্টান্টিনোপল রাজা অসম্মত হলে তিনি আরো সুযোগ দেন। শেষ পর্যন্ত শুরু করতে হয় ইতিহাসখ্যাত সেই ফজরি বিজয় অভিযান। ফজরের পরে শেষ হামলা চালান। আর তারপরই বিজয় এসে চুম্বন করে সুলতানের পদতলে।
সুলতান ফাতেহ মুহাম্মদ আর তার বাহিনীর সামনে শেষ হয়ে যায় বাইজেন্টাইন আধিপত্য। ইসলামি খেলাফতের সবুজ পতাকা উড়তে থাকে পতপত করে। এরপর উসমানি খেলাফতের রাজধানী বানানো হয় কনস্টান্টিনোপলকে। সেটা অবশ্য আরেক ইতিহাস।

সাইফ উল আজম

আকাশ জয়ের নায়ক

পাতাল দিয়ে নামব নিচে, ওঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে যতোই ঘরকুনো আর আলসে বলুক না কেনো, এই বাঙালি আর সেই বাঙালি নেই। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার মতোই তারা পাতাল আর আকাশকে জয় করে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। আসুন পরিচিত হই এমনই একজন বাংলাদেশি বৈমানিক যোদ্ধার সঙ্গে যিনি একসময় শাসন করেছিলেন পৃথিবীর আকাশসীমা। যদিও অধিকাংশ বাঙালিই ভুলে গেছে তার নাম আর কীর্তির কথা। এই আকাশযোদ্ধার নাম সাইফ উল আজম। অবশ্য তার অনন্য কীর্তির জন্য তাকে ডাকা হতো 'দ্য লিজেন্ডারি ঈগল অব দ্য স্কাই'।

পাবনায় জন্মগ্রহণকারী এই বীর বৈমানিক সাইফ উল আজম ১৯৬০ সালে কমিশন লাভ করেন পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার লুক এয়ারফোর্স বেস থেকে এফ-৮৬ এয়ারক্রাফট চালানো শেখেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে টপগান সার্টিফিকেট অর্জন করেন। তার সহপাইলটরা তাকে ডাকতো 'বর্ন পাইলট' (জন্ম বৈমানিক) হিসেবে।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে ফ্লাইং অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকার সময় তিনি ভারতে একটি বিমান হামলা শেষে ফেরার পথে দুটি ভারতীয় ফল্যান্ড ন্যাট বিমানের আক্রমণের মুখে পড়েন এবং তার মধ্যে একটিকে তিনি আক্রমণ করে ভূপাতিত করেন। তার ভিকটিম ফ্লাইং অফিসার মায়াদেবকে পরে পাকিস্তান যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করে। তার এই

সাহসিকতার জন্য তৎকালীন পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাকে সিতরা-এ-জুররাত (পাকিস্তান ডিফেন্স ফোর্সের তৃতীয় সম্মানজনক পুরস্কার) প্রদান করেন।

সাইফ উল আজম তার কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধেও। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে পাকিস্তান সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও ষোলজন পাইলটের একটি দল ডেপুটেশনে পাঠিয়েছিলো জর্দান এয়ারফোর্সে। সাইফ উল আজম সেই ষোলজনের দলে যোগ দেন।

৫ জুন ১৯৬৭ সালে ইসরায়েলি এয়ারফোর্স জর্দানের মাফরাখ এয়ারফোর্স বেস আক্রমণ করে। শুরু হয় ইসরায়েলি এয়ারফোর্স এবং জর্দানি এয়ারফোর্সের মধ্যকার ডগফাইট বা আকাশযুদ্ধ। সাইফ উল আজম সেই যুদ্ধে একটি ইসরায়েলি বিমান ভূপাতিত করেন এবং আরেকটিকে আংশিকভাবে বিধ্বস্ত করেন। যা থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে এবং পরবর্তীতে ইসরায়েলের দিকে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। সাইফের এমন বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে জর্দানের বাদশা হুসাইন তার ব্যক্তিগত গাড়িতে সাইফকে নিয়ে বের হন এবং ৪০ কিমি যাত্রাপথে সাইফকে বাদশাহ ছোটভাই হিসেবে সম্বোধন করতে থাকেন। জর্দান তার বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ তাদের ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'উইসাম আল ইসতিকবাল'-এ ভূষিত করে।

এর দুদিন পরে ইরাকি বিমানঘাঁটি এইচ-৩-তে হামলা চালায় ইসরায়েলি এয়ারফোর্স। কিন্তু তারা জানতো না তাদের দুঃস্বপ্ন বাঙালি সাইফ সেদিন একটি ইরাকি হান্টার যুদ্ধবিমান নিয়ে শত্রুর সন্ধানে উড়ছিলেন ইরাকের আকাশে। সাইফের বিমান চারটি বম্বার এবং তাদের এসকর্ট করা দুটি মিরেজের মুখোমুখি হয়। একটি ইসরায়েলি মিরেজের আঘাতে সাইফের বিমানের পেছনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সেই ইসরায়েলি মিরেজের পাইলট, ক্যাপ্টেন গিডেওন দ্রোর পরিণত হয় সাইফের শিকারে। দ্রোরের বিমান সাইফের হান্টারের আক্রমণে বিধস্ত হলেও দ্রোর প্যারাসুট দিয়ে নিরাপদে অবতরণ করে এবং যুদ্ধবন্দি হিসেবে ইরাকি বাহিনীর হাতে আটক থাকে।

একই সময়ে সাইফের দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হয় আরেকটি ইসরায়েলি বম্বার যার পাইলটও প্যারাসুট দিয়ে নামতে গিয়ে ইরাকিবাহিনীর হাতে বন্দি হয়। পরবর্তীতে ইরাকের কাছে বন্দি দুই পাইলটের বিনিময়ে ইসরায়েল ৪২৮ জন জর্দানি বন্দিকে মুক্তি দেয়। ২০০৩ সালে ইরাকি মিউজিয়াম থেকে উদ্ধারকৃত একটি ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর হেলমেট নিয়ে বিবিসি একটি নিউজ করে। সে নিউজে ক্যাপ্টেন দ্রোর (বর্তমানে ইসরায়েলের একটি কমার্শিয়াল এয়ারলাইনে কর্মরত) বলেন, সে সময়ের দুঃসহ স্মৃতি কিছুই তার মনে নেই। (ইসরায়েলিরা তাদের পরাজয়ের কথা সাধারণত এভাবেই চেপে যায়।)

সাইফ উল আজমের এই কৃতিত্বের জন্য ইরাকি সরকার তাকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'নাওয়াত আল সুজাতে' ভূষিত করেন। ভিনদেশে গিয়ে পাকিস্ত ানের মুখ উজ্জ্বল করার কারণে দেশে ফেরার পর পাকিস্তান সরকার পুনরায় এই অকুতোভয় বাঙালিকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'সিতারা-এ-বাসালাত' প্রদান করে।

সাইফ উল আজমের ইউনিক রেকর্ডগুলো হলো– তিনটি দেশের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি (পাকিস্তান, জর্দান, ইরাক)। তার মধ্যে পাকিস্তানেই দুবার। যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্স আকাশে তার নৈপুণ্যের জন্য 'লিভিং ঈগল' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সাইফ উল আজমকে। সারাবিশ্বে লিভিং ঈগল আছেন আর মাত্র বাইশজন।

১৯৭১ সালে সাইফ উল আজম অন্যান্য বাঙালি পাইলটদের মতো গ্রাউন্ডেড থাকেন। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীনের পর তিনি বাংলাদেশ এয়ারফোর্সে যোগদান করেন এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন হয়ে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার প্রধান এবং '৯১ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত সাংসদের দায়িত্ব পালন করেন।

অটল ইতিহাস

গুস্তাভো আইফেলের আইফেল টাওয়ার

ফ্রান্সের সুদৃশ্য নিদর্শন আইফেল টাওয়ারের কথা তো আমরা সবাই অনেক শুনেছি। বিভিন্ন ফটোগ্রাফ কিংবা টিভিতে এই অপূর্ব টাওয়ারটির চোখ ধাঁধানো কারুকাজও দেখেছি। কিন্তু এই টাওয়ারটি নির্মাণের পেছনের ইতিহাস আমরা হয়তো অনেকে জানিই না।

প্যারিসের আইফেল টাওয়ার পৃথিবীর বিখ্যাত কাঠামোর একটি এবং ফ্রান্সের অন্যতম একটি প্রতীক। গুস্তাভো আইফেলের নির্মিত ৩০০ মিটার (৯৮৬ ফুট) উচ্চতার এই টাওয়ার প্যারিসের প্রবেশপথও বলা হয়। ১৯৩০ সালে নিউইয়র্কে 'ক্রাইসলার বিল্ডিং'টির (Chrysler Building) নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত আইফেল টাওয়ারই ছিলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থাপনা।

ইঞ্জিনিয়ার গুস্তাভো আইফেল রেলের সেতুর ডিজাইন করতেন। টাওয়ারটি নির্মাণে তিনি সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। তার নামানুসারেই মিনারটির নাম রাখা হয়েছিলো 'আইফেল টাওয়ার'। ১৮,০৩৮টি লোহার বিভিন্ন আকৃতির ছোট ছোট কাঠামো জোড়া লাগিয়ে এই টাওয়ার তৈরি করতে ৩০০ কর্মীর প্রয়োজন হয়েছিলো।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১৮৮৯ সালের ৩১ মার্চে মাত্র দুই বছর, দুই মাস, দুই দিনে টাওয়ারটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিলো। এতো উঁচু আর এমন আকৃতির টাওয়ার বানাতে কিন্তু খুবই কম শ্রম ব্যয় করা হয়েছে। এই টাওয়ারের নির্মাণ কাজটি পূর্তবিদ্যা (Civil Engineering) ও স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা করেছিলো।

১৯০৯ সালে এর চূড়ায় বসানো হয় একটি বেতার এ্যান্টেনা। এতে তার উচ্চতা আরও ২০.৭৫ মিটার (৬৬ ফুট) বেড়ে যায়। সেই থেকে

আইফেল টাওয়ারকে বেতার তরঙ্গ প্রেরণের (Radio Transmision) জন্যও ব্যবহার করা হচ্ছে। পরে আইফেল টাওয়ারে একটি টিভি এ্যান্টেনাও সংযোজন করা হয়।

আইফেল টাওয়ার ইতিমধ্যে পার করলো ১২৭ বছর। এ টাওয়ার তৈরির সময় তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। শুরুতে এটি যেনো একটি ধাতব বস্তুর চেয়ে খুব বেশি কিছু ছিলো না। টাওয়ার চালু হওয়ার পর শহরের মানুষ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, প্যারিসের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল। বিশিষ্টজনরা গর্জে উঠেছিলেন, এ যেন এক দৈত্য, শহরের লজ্জা। এমনকি কমিটি গড়ে রীতিমতো 'আইফেল টাওয়ার হটাও' আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি সেনাবাহিনী নাৎসিদের অপব্যবহার রুখতে টাওয়ারের অংশবিশেষ ভেঙে ফেলার কথা ভেবেছিলো। হিটলার স্বয়ং আইফেল টাওয়ার ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদিও তা অমান্য করা হয়েছিলো।

সূত্র : *ইন্টারনেট*

ফকির মজনু শাহ

স্বাধীনতা সংগ্রামে এক দরবেশ ফকির

ঈসায়ি ১৭৫৭ সালে অস্ত গেল বাংলার স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। একটি জাতির ললাটে লেখা হলো দাসত্ব, পায়ে পরলো পরাধীনতার শেকল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ষড়যন্ত্রের কূটিল জালে ফেলে দখল করে নেয় বাংলার শাসনভার। এই বাংলা থেকেই শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয়ের ক্রান্তিসিঁড়ি।

বাংলার শাসনক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেলেও বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ কখনোই মেনে নিতে পারেনি সেই দাসত্বের শৃংখল। স্বাধীনতার জয়গানে জেগে ওঠে হাজারো কণ্ঠের মুক্তিসংগ্রামী। আর তা শুরু হয় পলাশীর পরাজয়ের মাত্র ৩ বছর পর ১৭৬০ সালে। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সংগ্রামের গোড়াপত্তন।

বগুড়া শহরের বারো মাইল দক্ষিণে গোয়াইল নামক জায়গার কাছে সদরগঞ্জ ও মহাস্থানগড়ের মাঝামাঝি কোনো এক নিভৃতপল্লীতে দানা বাঁধে বিপ্লবের প্রথম শপথ। এই এলাকা থেকেই সর্বপ্রথম ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ফকির মজনু শাহ নামের এক দরবেশ। পলাশীর পরাজয়ের পর ইংরেজদের অপশাসনকে প্রথম চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাদের শাসনের বিরোধিতা করেন এই ফকির নেতা।

ফকির মজনু শাহ'র অতীত নিয়ে খুব একটা জানা যায় না, তবে ধারণা করা হয়, তিনি ভারতের মিরাঠের কোনো এক জনপদ থেকে ধর্মীয় আধ্যাত্মবাদ প্রচারের লক্ষ্যে প্রায়ই আসতেন বাংলাদেশে। তিনি মাদরিয়া সিলসিলার পীর ছিলেন। বাংলার মাদরিয়া সুফিসাধক সুলতান হাসান সুরিয়া বোরহানার মৃত্যুর পর তিনি মাদরিয়া তরিকার পীরের আসনে স্থলাভিষিক্ত হন। ভক্ত অনুরক্ত নিয়ে ধর্মপ্রচারে তিনি ঘুরে বেড়াতেন বাংলাদেশের নানা প্রান্তে। স্থায়ী কোনো খানকাহ বা বাসস্থান ছিল না।

অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন শিষ্যের বাড়িতে বা এলাকার ধনী-জমিদারদের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। বিত্তবানদের আনুকূল্যে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পেতেন এসব ফকির-দরবেশ।

এতোদিন পর্যন্ত বেশ ভালোই চলছিলো দরবেশ-ফকিরদের ধর্মীয় আধ্যাত্মবাদ প্রচার। কিন্তু ইংরেজরা বাংলা দখল করার পর জমিদারদের নিষেধ করে দেন– এসব ফকির-দরবেশদের কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য। এমন ধর্মবিরোধী এবং অবমাননাকর নির্দেশে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ফকির-দরবেশসহ সাধারণ জনগণ। এরই প্রেক্ষিতে ফকির মজনু শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের শাসন না মানার ঘোষণা দিয়ে বিদ্রোহ করেন। ফলে ইংরেজরা তাকে গ্রেফতার করার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। শুরু হয় সংঘাত।

এই ফকির আন্দোলন পর্যায়ক্রমে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তা কেবল ফকিরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; হিন্দু সন্ন্যাসী, সাধারণ কৃষক, মুটে-মজুর, তাঁতী, জেলে, কামার-কুমার– মোটকথা শোষিত সব জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে এবং আপামর জনতা ফকির বিদ্রোহকে স্বাগত জানায়।

১৭৬০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ চার দশকে অবিভক্ত বাংলার নানা জায়গায় এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে। বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহে ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ সবচেয়ে বেশি বেগবান হয়ে ওঠে। তার এই আন্দোলন শুরু করার পর স্থানীয় হিন্দু সন্ন্যাসীরাও তার দলে যোগ দেন। কারণ, দাক্ষিণ্য নিষেধাজ্ঞার একই খড়্গ তাদের ওপরও পতিত হয়।

১৭৬৩ সালে মজনু শাহর নেতৃত্বে ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। মজনু শাহর সঙ্গে ভবানী পাঠক নামের শীর্ষ হিন্দু সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে হিন্দু সন্ন্যাসীরাও যোগ দেয়ায় এ বিদ্রোহ ব্যাপকতর রূপলাভ করে। একই বছর ফকির বিদ্রোহীরা বরিশাল এবং ঢাকায় ইংরেজদের কোম্পানিকুঠি আক্রমণ করে দখল করে নেয়। এরপর রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যকুঠি আক্রমণ করে।

এ ফকিরদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘাত চলতে থাকে সত্তর এবং আশির দশকজুড়ে। ১৭৬০ থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত বিদ্রোহ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় হলেও ১৭৭১ সালের পরে তা ব্যাপক আকার লাভ করে। ফকির বিদ্রোহের এমন সংঘাতময় অবস্থায় ইংরেজরা ১৭৭১ সালে ১৫০ জন ফকিরকে গ্রেফতার করে তাদের কামানের গোলার সঙ্গে বেঁধে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করে, যা এ অঞ্চলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং এ ক্ষোভ পরবর্তীকালে ভয়াবহ রূপ নেয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঢাকা আক্রমণ হয় ১৭৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এ সময় ঢাকার স্থানীয় প্রশাসন হয়ে পড়ে প্রায় অবরুদ্ধ। ঢাকার প্রধান প্রশাসক মি. কেলসন কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জানান, ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের যাতায়াতের পথে যে কোনো স্থান থেকেই অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম।

তখন এই দলবদ্ধ আক্রমণে ইংরেজ ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড নিহত হন। ফকির মজনু শাহর হাত ধরেই বাংলায় স্বাধীনতার জন্য বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম শুরু হয় চোরাগোপ্তা হামলার গেরিলা যুদ্ধ।

১৭৮৬ সালে ময়মনসিংহের কাছে এক ভয়াবহ সংঘর্ষের পর ফকির মজনু শাহ ভাওয়ালগড়ে আত্মগোপন করেন এবং ১৭৮৭ কিংবা ১৭৮৮ সালের কোনো এক সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর ফকির আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। মুসা শাহ, চেরাগ আলি শাহ, সোবহান শাহ, মাদার বখশ, করিম শাহ প্রমুখ ফকির নেতা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে পারেননি। তবে আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রপথিক যিনি, যার লালিত স্বপ্নে বাংলার স্বাধীনতার অগ্নিদীপ্ত সূর্য বারবার ঝলসে উঠেছে স্বাধীনকামী মানুষের চেতনায়– তিনি ছিলেন তাদের সবার প্রেরণার উৎস এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় নেতা। একজন আলাহভক্ত-পীরের হাত ধরেই পলাশী-উত্তর বাংলায় ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির আওয়াজ তোলেন বাংলার আপামর শৃংখলিত পরাধীন জনতা।

সুতরাং এ সংঘাতকে কেবলমাত্র ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর আস্ফালন বলে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না এবং বাংলার স্বাধীনতার জন্য প্রথম যোদ্ধা হিসেবে যদি কার নাম লেখা হয় তবে তিনি এই ফকির মজনু শাহ।

বদরের যুদ্ধে হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস [রাদিয়ালাহু আনহু]-এর ধনুক থেকে প্রথম তীর বের হওয়ার দরুন তিনি যেমন 'আশারায়ে মোবাশশারা' হয়েছেন তেমনি বাংলার স্বাধীনতার জন্য এই দরবেশ ফকির মজনু শাহ যেভাবে ইংরেজ বিতাড়নে লড়াই করেছেন তাকেও বাংলার ইতিহাসে সেভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

** বাংলাপিডিয়া*

** প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী মজনু শাহ : এ জেড এম শামসুল আলম*

** 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে দরবেশ যোদ্ধা'*

(মূল শিরোনাম : "Warrior Ascetics in Indian History")। আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী. ৯৮ (১): পৃ. ৬১৭৭৫।

প্রকাশক : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। (ক্যামব্রিজ, যুক্তরাজ্য)

** বাংলার মুক্তি সন্ধানী : সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, রাখী চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশকাল ২০০৫, কলকাতা*

** বিদ্রোহী ভারত : নীহাররঞ্জন গুপ্ত। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ-১৩৯১*

** Wikipedia*